- কাব্যডায়েরি/ অনুবাদ কবিতা
- কবিতা / ই-বুক
- প্রবন্ধ

শূন্যকাল ৯

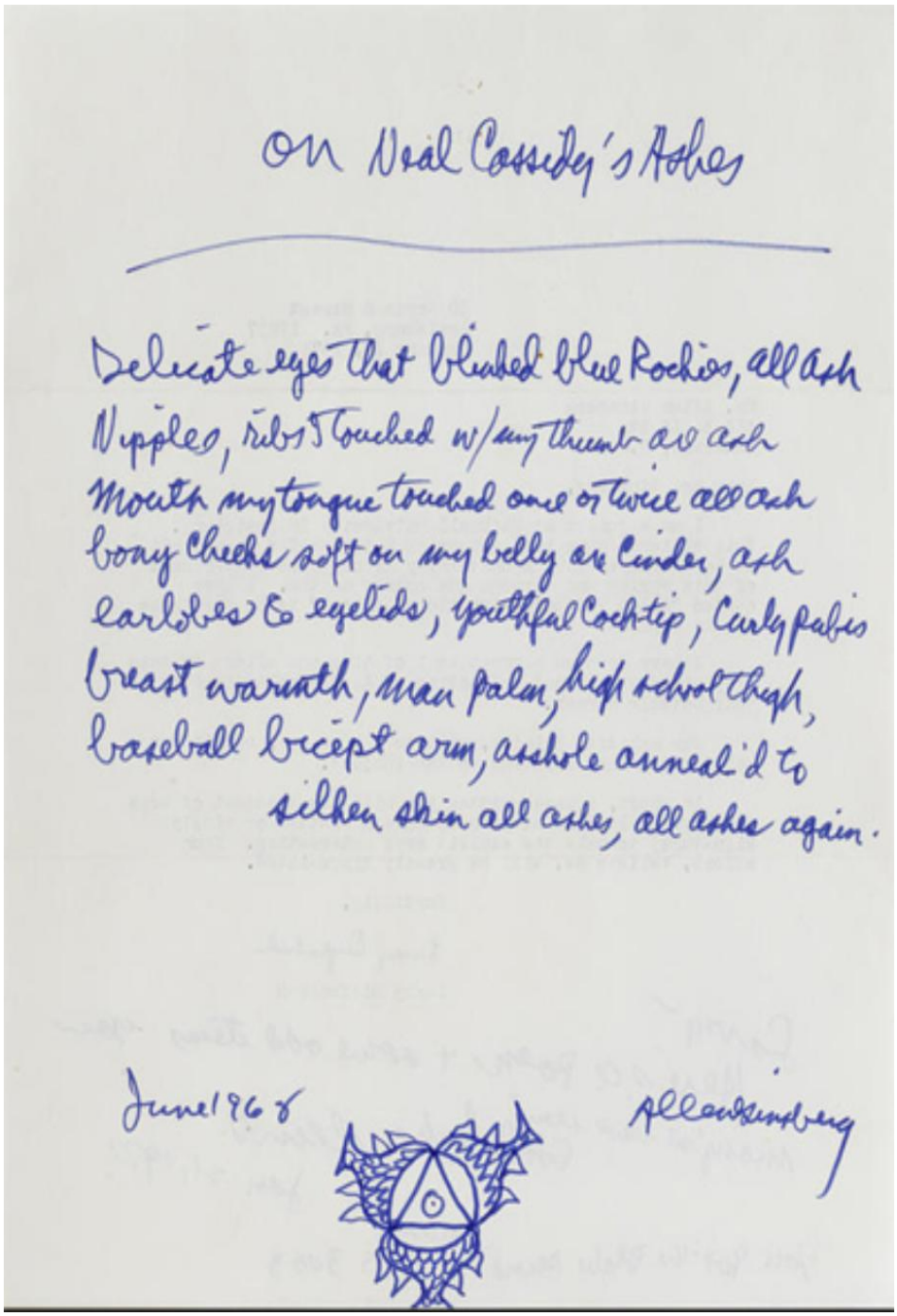

On Neal Cassidy's Ashes

Delicate eyes that blinked blue Rockies, all ash
Nipples, ribs I touched w/ my thumb are ash
Mouth my tongue touched once or twice all ash
bony cheeks soft on my belly are cinder, ash
earlobes & eyelids, youthful cock-tip, curly pubis
breast warmth, man palm, high school thigh,
baseball bicept arm, asshole anneal'd to
silken skin all ashes, all ashes again.

June 1968

Allen Ginsberg

Kolkata Book Fair, 2015 * Editor: Dipankar Dutta * Email: deepankar_dutta@yahoo.co.in * 9891628652 * Delhi

<u>এই সংখ্যায়</u>

কাব্যডায়েরি : ঋষি সৌরক, রবীন্দ্র গুহ, দেবযানী বসু
ইংরেজী কবিতা : দিলীপ ফৌজদার
অনুবাদ কবিতা : দিলীপ ফৌজদার, গৌতম দাশগুপ্ত, দীপঙ্কর দত্ত
কবিতা : উৎপলকুমার বসু, মলয় রায়চৌধুরী, অলোক বিশ্বাস, অনির্বাণ চট্যোপাধ্যায়,

জপমালা ঘোষরায়, নীলাব্জ চক্রবর্তী, অনুরাধা বিশ্বাস,

অন্তনির্জন দত্ত, হাসান রোবায়েত, ইন্দ্রনীল ঘোষ, তানিয়া চক্রবর্তী,

হাসনাত শোয়েব, উমাপদ কর, পীযূষকান্তি বিশ্বাস, মাণিক সাহা,

ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী, দীপঙ্কর দত্ত
প্রবন্ধ : রমিত দে, উমাপদ কর

---

21 July. Don't despair, not even over the fact that you don't despair. Just when everything seems over with, new forces come marching up, and precisely that means that you are alive. And if they don't then everything is over with here, once and for all.

কাব্যডায়েরি

ঋষি সৌরক

খাত ভাঙ্গতে এসেছি (গুগল ট্রান্সলেটর : LULA I S GONE)

২০১৪- র প্রথম দিকে, কিছু জৈবনিক মন্তির পর

অবশেষে খাঁচা খুলে যে প্রাণীটির ছায়া ছেড়ে দিলাম
তাঁর কোনও হাড়হিম স্তন বা আণ্ডা নেই জন্মসূত্রে
এতদ্ব্যতীত যথা ক্ষুধা- তৃষ্ণা- ঐন্দ্রজালিক বলয়

ঈষদুষ্ণ রক্তনেশায় পাগল দশচক্রে ভগবানবেশী ভূত
নিজের মস্ত দুই দাঁতাল দুলিয়ে গায়েব যাচ্ছে ওই
এরা আমার ভয়ের সারথি ক্যারাভ্যান বোঝাই গথভাণ্ড
ধ্রুবতারা তো চাই না, চাই না প্রেমের কাফনে শূন্যের লোগো
প্রতিটি ভাঙ্গনের ইতিহাস অদৃশ্য এক টার্বুলেন্স- এর কথা বলে
প্রাকৃতিক মেটাফোর ভুগতে ভুগতে সুতোল টানেরা বিলীন
যাদের স্বপ্ন ধোঁকা দেয় না তারা ভোরবেলার সহযাত্রী
পুরোপুরি আলো বা ফুল ফোটার আগেই ছায়াকরিডোর দুলছে
কিছু জৈবনিক গন্ধ শূন্যের খাঁচাকে অবশীভূত করেছে

দশমী'১৪ আরও একটি প্রত্যাশিত মৃত্যুর ঠিক একবছর পর

আর কতবার ঘুমন্ত স্বৈরাচারকে আস্কারা দিয়ে উসকে দিবি তুই
অনন্য ধুলোর দুর্গ নির্বিকার ফুঁ তুড়িয়ে ধূলিসাৎ
গভীর থাবা নৈরাশ্যবাদের কপচে দিয়েছে কল্পতরু
ডায়েন দ্যোতনায় যাবতীয় নাড়ি- নক্ষত্র ঘুরিয়ে- ফিরিয়ে- আছাড় মেরে
আমার শ্বাসমূল এখন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে পরাবাস্তব অঙ্গুলিহেলনে
এক অসম্ভব পাগলাগারদ ভেঙ্গে নিখোঁজ হয়েছে প্রেম
তার শরীরে মাংসে হাড়ে মজ্জায় ধর্মে জিরাফে চাবুকছোঁকা তুকতাক
ঠিকানা পেলে ফিরিয়ে এনো না অমঙ্গল চোখে চোখ রেখে বোলো না কথা
অচেনা পথিকের মত পাশ কাটিয়ে যাও ভুল পথে হতে দাও পলাতক নিশ্চিহ্ন
ওই তিলমাত্র পাপ খুঁত হয়ে বিষিয়েছে আলিঙ্গন
তিল তিল ফিকে হওয়ার চেয়ে হাউই রঙে ফেটে যেতে চাই
- ওকে আরো একটু ভুল পথে ঠেলে দাও, আরো একটু নৈরাশ্যবাদে মুক্তি

কোনও এক ডানাছেঁড়া সন্ধেয়

কানায় কানায় রাত্রি হলে সসঙ্কোচ কিছু উন্মাদনা জেগে থাকে
সদ্য ছিঁড়ে যাওয়া ডানার রেশ উড্ডয়ন মায়া তখনো ঝাপটায়
সংবেদনশীল পেশীদের রসনায় থিকথিকে নিরালম্ব অন্ধকার
সেখানে প্রবেশ নেই সেখানে নিষেধ নেই নেই নেহাত প্রস্থান
ঠা ঠা নার্কোটিক সমর্পন সমস্ত পাল্লা তুলে দাঁড়িয়ে
কখনো দুকূল ছাপানো জলস্রোত কখনো জড়ো হতে থাকা মেঘ
গভীর অরণ্যে ধাঁধা ধরিয়ে দেওয়া প্রাগৈতিহাসিক পথ
কাছেপিঠেই একটা বদনামী গাছ চুপচাপ শিকারকে জড়িয়ে ফেলছে
এসব কোনোকিছুই প্রভাবিত হচ্ছে না তোমার পার্শ্বরেখায়
সমস্ত বিভব যেন সেঁধিয়ে গেছে মৃত লাফডুফ রেখাচিত্রে
সম কাম সম মাৎসর্য্য সম লয় সম সময় সম অন্তরাল
ততোধিক বস্তুযুগলের আপাত সুতো ভোকাট্টা

যে যার নিজের মত ভাসছে নিজের দ্বন্দ্বে আন্দোলিত
এই অন্ধকারে উপ- অপ- অধি যত পরিধিই ভাবতে পারো
সব শালাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে তোমারই গর্ভে করবো পাতন
ঘোর অমানিশা ছুঁয়ে বিগলিত হবে লক্ষকোটি ছায়াপথ
আসলে আমরাই আমাদিগে ধরে রেখেছি সুতোয় শিরায় সার্কিটে

আমরা বলতে,
অতীতের আমি - বর্তমানের আমি - ভবিষ্যতের আমি

৮- নভেম্বর'১৪ - ছদ্মনামটা আর ভালো লাগছে না

এদের সবাইকে নিয়ে একটা ঝড় উঠুক - ধুন্ধুমার ধাঁসু
যেসব মহীরুহ শাখা- প্রশাখায় বিছিয়ে রেখেছে উৎকণ্ঠা অমনিবাস
তারা মুড়িয়ে যাক জন্মের মত গল্পের মত চিৎপাত
গোলাপী বাইসাইকেল না সিন্ধুলবণ - সিদ্ধান্ত ছুঁতে ছুঁতে
জিহোভা ঠেঁকিয়ে ফেললাম, ছবি আঁকতে পারি না তাই
ইজেলশুদ্ধ ক্যানভাসটা গলে গিয়ে নিজেই নদী হয়ে গেলো
পার্শ্ববর্তী সহবাস কে কেও বললো সভ্যতা কেও বললো শ্মশান
ঠোঁটে ঠোঁট রেখে উঠব চিতাকাঠে ধূসরের আনুক্রমিক বহুরূপ
অতিপ্রাকৃত আলোয় পপিফুল ছুঁড়ে মারবো অভিকেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে
সব ধুলো ধুলো ধুলো করে দোবো পারম্পর্য ও চেতনায়
ঢুলতে ঢুলতে হাত নিশপিশ দর্শন থেকে ইতিহাস
উড়তে উড়তে রূপোলি বুলেট সচ্চিদ থেকে কু
ধুঁকতে ধুঁকতে খাত ফেঁড়ে দোবো এস্পার থেকে ওস্পার
ভেঙ্গে দোবো গুড়িয়ে দোবো ফাটিয়ে দোবো প্রতিমা পালক কচলে করবো দলা
এক নিঃশ্বাসে সব গিলে নিয়ে উগরে দোবো ভূষণ্ডীর ঝাঁঝালো গুদে

ঐ দিন আরেকটু পরে, ভোরকালীন . . .

আমি এক শব্দে নির্বাসন হাজার শব্দে নদী
নির্ভীক চিৎকারের শেষে সহস্রাব্দ নিবিড় বিরতি

৩০- শে নভেম্বর ১৪ তাঁবুর নীচে দ্বিতীয় রাত অবশ ও ভীত

পরিমিত কোনো সংলাপ নেই
নেই রঙ্গমঞ্চ এবং যবনিকা পতনের অনিবার্য তাগাদা
পাতলাটে তাঁবুর ছাদ বয়োজ্যেষ্ঠ পরকীয়াবৎ সতর্ক করে, হুসসসসস. . .
পাতাখসার চেও নিবিড় অথচ মন্থর শ্বাস
জঙ্গুলে স্পন্দন নিজের দিকে টেনে নেয় নিশীথ মাংসাশী ছায়া
জিঙ্গল আকাশের নীচে আমাদের ঘাম খুব ভারী হয়ে ওঠে

সেই প্রথম দূরত্ব কাকে বলে উপহার পাই
কতটা সেঁধিয়ে গেলেও ঠিকঠাক তৃপ্ত হয় না মন
ভয়ের অনন্ত শেকড়ে চিমটেমত যৌনস্বাদ
মধ্যবিত্ত শৈশবতুল্য রাজ্যজয়ের বাসনাবিহীন
সংসারী মাকড়- জাল পরিব্যাপ্তির আসরটুকু জমিয়ে নিতে চায়
অত্যন্ত স্বগোপনীয়তাগুলি যেভাবে মাধুর্য্য হারিয়ে অলস
মৃত্যুকালীন প্রাণ ঠিক সেভাবেই চোখ বোজে
এঁটো জীবনের পসরা ছাড়িয়ে ... তবে কেও কেও
শেষ প্রশ্বাস আমূল পুরে ফুলিয়ে তোলে বেলুন
ফিরে আসবার পথ অসম্ভব জেনেও দৌড় লাগায় দিলদার
বিশ্বাস করুন সেসময় মাথায় কি যে চলে ব্যাখ্যা করা মুশকিল
পরিচিত- অপরিচিত জ্যামিতি বা ডাকের ভুবনভোলানো কূপ

৩১- শে নভেম্বর১৪ অসম্ভব ভয় লাগছে

দৌড় দৌড় শুধু দৌড় ... মৃত্যুর অসহ সৌন্দর্য্য আমার ধারণ- অতীত

২৪ শে ডিসেম্বর১৪ নাইট শিফট

হঠাৎ যেন অনুভব করি আমি আর শুনতে পাচ্ছি না
নৈঃশব্দের মধ্যেও বাতাসের কিছু স্তর ছিলো
পিঠে পিঠ ঢুকিয়ে অস্তিত্বের গান- বাজানা উপুড় করা মদিরা
সব হাতলের শরীর আজ বোবা হয়ে গেছে
অথচ লালামিতির ক্যামোফ্লেজে আটকে থাকা অপ্রাকৃত কোনো ঘুড়ি
ভোররাত গায়ে জড়িয়ে নিশীডাকশপ্ত চরাচর পার করে

২৬শে ডিসেম্বর১৪ উত্তরায়ন আসছে, একটা মাঞ্জা দেওয়া অদৃশ্য সুতো কোথাও যেন জড়িয়ে গেছে

সমস্ত আকাশটাকেই আমি সুতো ছেড়ে উড়িয়ে দিতে পারি মামনির মা
কোথায় কোন প্রসংগবর্জিত জঙ্গলে খসে পড়বে
সেই বদনামী গাছের ডালে দঁড়কচা ঝুলন্ত কাঠামো
যাকে তোমরা আকাশ বলো যাকে তোমরা বলো বেঁচে থাকা -
একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলে ধীমন্থর কোনো স্বপ্নের লেজ
দিয়ে বেরিয়ে আসছো মামনির মা আর বুক ঘঁষটে খুঁজে নিচ্ছো খসে পড়া বাহারী ছাল

ঘটাতে আমি পারি সবই ম্যাজিক থেকে ধর্ষণ -
এই আঙ্গুলের ডগা যা কিনা নেচে ওঠে প্রতিটি অক্ষরের লাস্যে
ঢুকিয়ে দিতে পারি আমূল অন্ধকারে

কিন্তু আমি আর শুনতে পাচ্ছি না

সব মদের রঙ আমার একরকম লাগছে
হিড়িম্ব শুকরীর তাঁতে তাঁত চুম্বন করছি
বলতে পারো ল্যাংটো বিজ্ঞান খাবি খাচ্ছে অথবা অথৈ বাস্তব
স্নায়বিক সুরার মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে এখন সব ক্রিয়াই জৈবনিক
যে কিশোরীকে চমন করতে শুরু করেছিলাম সেই কোন অন্ধকারে
আজ এই বার্ধক্যের ফ্রি ফলেও তার হেমন্ত জমাট বাঁধে নি

আজ সে মৃত

০২/০৩/২০১৪ পুনঋকোভবঃ

ঘুম সেই দৈব বস্তু

অন্তহীন উন্মাদনা এবং উপন্যাসের শেষে আধখাওয়া অলিগলি ধরে
সংবেদনশীল মথ ঘুরপাক খায়

এক- একটি বিভঙ্গে ভাঙ্গতে থাকে রাত
চেতনার অন্যপিঠ উন্মুক্ত
এখানে সকল রমন ইন্দ্রিয়াতিগ
আলোর বিচ্ছুরণ অদ্ভুত কায়দায় পকেটে লুকিয়ে
ঘুমোতে যান স্বয়ং বিধাতা

যত হৈ হৈ যত হাটবাজার চাহিদা কে সম্বল করে পুটকি তে আছড়ে পড়া পরিধি
দল বেঁধে হরিণেরা জল খেতে আসে পাথুরে জল গোধূলি ওমে ভরপুর
কিভাবে পিপাসার চোরাস্রোত গলে যায় প্রাকৃত- অপেরা ছেড়ে বহুমুখ নির্জন
গলিত পরশপাথর জানে-   আদল নিকোলে ক্ষয়িষ্ণু স্মৃতিদের খড় ভিজিয়ে রাখি
সেখানে বন্যদুটি চোখ ফুরিয়ে আসা আলেয়ার মত দেদীপ্যমান

মাশরুম খোসা উড়ে যায় বৃষ্টিদিনের গানে

___________কাব্যডায়েরি___________

রবীন্দ্র গুহ

উড্ডুক্কু গ্রীষ্মে
খামোশ পাখিদের খোঁজ,
সঙ্গলিপ্সার কাহাবত

৪.৩.১৯৯৯, বৃহস্পতিবার .... ৫.৪.২০০০, বুধবার

হা- আকাশের দিকে মুখ করে হৃত- উল্লাসে কূর্মপৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ঘোরক্ষিপ্ত বেলা - বাতাসে তীব্র তাত, তাহে তপ্তখোলার বালু, আরাবল্লি পাহাড়ে দাবানল আঁকড়ে- কুঁকড়ে- থাকা দগ্ধানো লতাপাতা, বৃক্ষরাজি বিষাদকাতর, যুগপত পাখিদের ছিৎরে- ফাটা চিঁহি- চিঁহি রব - কতদিন অমঙ্গলের বিরোধীতা করিনি - কতদিন পানশালায় যাইনি, জ্বলনশীলার সাথে পানাহার করিনি, উড়োমানুষের গল্প শুনিনি □
এখন সমস্ত কূর্মপৃষ্ঠ টলছে, আবলুশ ছায়ারা অদ্ভুত তৎপরতায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ভয়াবহ বালির পাহাড়, হাততালি দিয়ে ছুটছে উলঙ্গ ছেলেরা ধুধু- মরুপ্রান্তরে - - ।
শহর পত্রিকার তুমুল দোর্দন্ড- দোগলা- সম্পাদক অজিত রায়ের খত্ :

"শুনলাম আপনি এখন মহাভারতের গুরুগ্রামে ! আমি তো দামামা বাজিয়ে দিয়েছি - কুরুপাণ্ডবদের বংশধর জাঠগুজারদের নিয়ে বাংলাসাহিত্যের শেষ উপন্যাসটি লিখছেন গদ্যকার নিয়োলজিস্ট রবীন্দ্র গুহ। অধিকন্তু, থাকছে বিপরীতে পিছরেবর্গের চূড়াচামারদের নিত্য- সংঘাত। একশত মহিষের থান- তবেলা। চূড়ারা বলে, গিতোয়ার, অর্থাৎ বাথান। বাথানে জগদ্দল- আঁধার। রবীন্দ্রদা, আপনিতো শব্দের কোটিপতি, কথনবয়নের যুগশ্রেষ্ঠ কারিগর - একারণেই, আপনাকে বলা হয় বৃহৎবাংলার ডায়াস্পোরিক দ্রোহপুরুষ। আপনার জয় হো - - "

'কঅঁ কঅঁ' শব্দ করে উড়াল দিয়ে চলে গেল এক ঝাঁক ময়ূর- ময়ূরী। অজিত রায়ের চিঠি চিড়ফাড় করে দিল বুক। কি নিয়ে লিখবো ? মহিষের থান- তবেলা ? মরুভূমি ? মাইল- মাইল বৃক্ষলতাশূন্য বিরান প্রান্তরজুড়ে আঁধিঝর ? পহেলবানের হুমকি - "শালু, হারামখোর গীদ- কি- বাচ্চে !" এই নিয়ে গল্প হয় ? অধিকন্তু ভাষা ? হরিয়ানভি রুখা শব্দ, ক্ষুৎপিপাসার শব্দ, গঁবারু শব্দ, খেউড়ে শব্দ, অনগরন শব্দ - শুধুমাত্র বিষয়- সন্ধানীই নয়, শব্দ- সন্ধানীও হতে হবে। এসবের জন্য চাই শ্রম, অসাধারণ নৈপুন্য, বহুকৌণিক বিন্যাস, বাংলা বাচনের সাথে হরিয়ানভি বাচনের মিলন - একদিকে জাঠদের সাধের হাভেলি, অন্যদিকে গুজার ও যাদবদের বাস্তিল, আরো আছে চূড়াচামারদের ঘাঁটিবস্তি -
দূর থেকে দেখলে গ্রাম বলে ভ্রম হয়, আসলে গ্রাম নয়, গ্রামের মতই অনেকটা। পাহাড়ী সমতলে রুখাশুখা শূন্য প্রান্তরের মধ্যে গায়ে গায়ে জড়ানো কুড়েখানা। ফসলের চিহ্ন নেই, গরুমোষের থান- তবেলা নেই, ছড়িয়ে ছিটিয়ে দু- চারটে মহাবাবুল আর নিমগাছ আহিরদের টিলার মাথায় উড়তা পতাকা, আর আওয়াজ -

- "ক্য হোয়য়্যা পুত্তর ? ক্য হোয়য়্যা ?"

এবং হঠাতই "অয়ঁ শ্যালু মন্নু, নিকম্মা, হুক্কা বদল দে - - "
চূড়াদের ছেলে মন্নু, সব সময় সিঁটিয়ে থাকে, তরুণ মুখখানি ক্ষণেকের জন্য প্রকাশিত, পুনশ্চ কক্ষে ফিরে যায়। লাজুকে দেখলেই বুকে তার ডুগডুগি বাজে। বাঁকাচোরা হাসে। নিশ্বাস ধড়ফড় করে - হাঁ, লাজু অন্ত পরাণ তার। সাঁ - সাঁ ধুলোর ঝড়, খানাখন্দ পেরিয়ে তাউ দুধা সিংয়ের থান- তবেলায় চলে এলাম। চারদিকে মোষের গু- মুত, পঙ্ক। আমার উপস্থিতি কেউ খেয়াল করেনি। দড়ি বাঁশের খাটিয়ায় কাত হয়ে হুক্কা টানছিলেন তাউজি লোলচর্ম মুখখানি বেজায় ফুর্তিলা। তার কথায় যেমন সরলতা ছিল, যুগপত মায়া- বর্তমান। যে স্ত্রীলোকটি, মাত্র ল্যাহঙ্গা- চুন্নি পরা - নবীনা দেহটি। সে মহিষের স্থলস্তন থেকে দুগ্ধ দোহন করছিল, একবার তার দিকে একবার মহিষের স্থলস্তনের দিকে তাকিয়ে তাউ দুধা

সিং বেজায় হরষিত, মুখখানি তুলে উঁই উঁই শব্দ করলেন, নগ্ন উরু চাপড়ালেন, বললেন -
"ওয়ঁ হোয়ঁ, ঝুমকা ঝুলথ রে - - "
তাউজির এতদিরিক্ত অল্প বোজা চোখ, ছেঁড়াচেঁড়া সতরঞ্চকাটা চাহনি -
আমাকে দেখলেন, অত্যন্ত অধৈর্য হলেও স্মিত হাসলেন, গলার কিঞ্চিত ধিমা, হুক্কার
নলটি হাত বদল করে বল্লেন - "কৌন ছে ?"
তখনো কপাল থেকে, কাঁধ থেকে, মেরুদণ্ড থেকে ঘাম ঝরছিল, আমি বল্লাম
"মন্নে পরদেশী হুঁ - "
"কা কাম ছে ?"
"আপসে মিলনে আয়া - "
"মন্নে বড্ডা খুশ হুয়া, আওজী আও - বয়ঁঠো, হুক্কা পিও - "
আমি হুক্কার নলটি হাতে নিলাম। পরীগতর স্ত্রীলোকটি, যে মহিষের স্থলস্তন মর্দন করছিল,
সে, রাধাবাঈ আড়ে আড়ে তাকাল। নবীনা মহিষটির নিতম্বে হাত বোলাল। হাতখানি,
হাতের আঙুলগুলি মিহি গোলাপী ফুলকলির মত। নজরটি বয়সোচিত ধর্মে উষ্ণ,
এলেবেলে মারাত্মক -
হুক্কায় প্রথম টানটি দিতেই মাথার ভিতর বিদ্যুতবিভার ঝটিতি ঝিলিক।

৩০.৫.২০০০, মঙ্গলবার ..... ৯.৬.২০০০, শুক্রবার

এক- এক দিন ঘোরাঘুরি করতে করতে পথ হারিয়ে ফেলি, ঘাঁটিবস্তি যাবো বলে চলে যাই
দারুহেরা, ফুলঝোর, সি- গাঁও, ডি- গাঁও - -
সবদিকে আঁধিঝড়ের দাপট, কোথাও জল নেই, ছায়া নেই, মেয়েরা পাহাড়ের দিক থেকে
মহিষ তাড়িয়ে ফেরে। অজিত রায়ের চিঠি আসে :

"উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির অপেক্ষায় আছি। কতদূর এগোল ? দেখবেন, আরাবল্লী পাহাড় ও
বিরান মরুভূমির সৌন্দর্য যেন ক্ষুন্ন না হয় ! জাঠগুজার, চূড়াচামারদের মতই পাহাড় ও
মরুভূমি উপন্যাসের বিশেষ চরিত্র। প্যাটার্নটা ঠিক রাখুন - রকমফের প্রেম - দোসুতি
ভাষা - দ্বন্দ্ব - লড়াই - "

অজিতের চিঠি আমাকে উপন্যাসের প্রচলিত সংজ্ঞাকে অস্বীকার করতে শেখায়। হরিয়ানভি
সমাজ, রহন- সহন, কুশীলবদের বর্গায়তন, আকাংখা সম্পূর্ণ অন্যরকম - সর্বক্ষণ দারুণ রোষে
রক্ত ঝাঁ- ঝাঁ এক বিন্দু জলের জন্য, শস্যদানার জন্য, যৌনক্ষুধার জন্য, মানুষ পশুর মত
হানাহানি করে। একদিন দেখলাম সেই নবীনা স্ত্রীলোকটি, যার নাম রাধাবাঈ, মাথায় ফেট্টি
বাঁধা, হাতে- পায়ে বেড়ি, আধখোলা উভরানো স্তন, মহিষের থান- তবেলায় শেকল দিয়ে বাঁধা।
বাতাস কাঁপিয়ে তাউ দুধা সিং গর্জাচ্ছিলেন - "শালী, লুচ্ছে, বদগুমানী, তেরী স্তনুয়া কাট লেয় - "

১.৮.২০০০, মঙ্গলবার ..... ২.৯.২০০০, শনিবার

যেমন কথা তেমনি কাজ। একদিন ভোরে দেখা গেল মরুমাঠে অনেক মানুষের জটলা।

বের- কাঁটার ঝোপের মধ্যে মৃত রাধাবাঈ। রক্তে ভেসে যাচ্ছে। দুটি স্তন কাটা আর নিম্নাঙ্গ থেঁতলানো। পুলিশ এসেছিল। হাইওয়ে থেকে ফিরে গ্যাছে। এমন ভয়ংকর কথা আমি লিখতে পারব না। মানুষের দুঃসাহসের কথা, ব্যক্তিগত লোভ, ক্ষোভ, হিংসা, স্বার্থপরতা, দ্বিধাদ্বন্দ্বের কথা লেখা যায়। কিন্তু এহেন নৃসংশতার কথা লেখা যায় না। বুকের কাছে হাত জড়ো করে বেশ কিছুদিন একা ঘরে চুপ করে বসে রইলাম। আবার অজিতের চিঠি এলো :

"আমার যেমন বেনী তেমনি রবে চুল ভিজাব না" - নীতি প্রত্যাখ্যান করুন। শুনলাম গুরগাঁওয়ের কাছেই নূহু বলে কুখ্যাত একটা গ্রাম আছে। ওখানকার মানুষ নাকি জাঠগুজারদের চেয়েও নিষ্ঠুর, হিংস্র। ভিন্নজাতের ছেলেকে বিয়ে করার জন্য মেয়েটিকে টুকরো টুকরো কেটে শূন্যে ছুড়ে দিয়েছে ! এই পাপকর্মটি বাদ দেবেন না। হোক তা ভিন্ন জাতের, ভিন্ন ধর্মের - ভারতবর্ষের মানুষ তো - - ভালো কিছু লেখার জন্য অনেক কষ্ট অনেক যন্ত্রণা সইতে হয়। নরকের নর্দমায় নামতে হয়। "

ছুটলাম নূহু গাঁয়ের দিকে। বেশ রমরমা আছে। সুন্দর ফলের বাগান সহ বাড়িঘর, মসজিদ, গোরস্থান। মানুষগুলি লম্বা- চওড়া পাঠানদের মত। কিন্তু কেউ একটি কথাও বলছিল না। চোখের দিকে তাকালেই মনে হয় বুকে সাঁ- সাঁ ধুনন। বাদশাদের আমলে এদের পূর্বপুরুষরা সৈনিক ছিল। সেই দাপট এখনো আছে। ঝাঁঝাঁলো মুখ। ক্ষিপ্ত চাহনি। মধ্যাহ্নে যেমন অপরাহ্নেও সূর্য খরতর। ওরই মধ্যে তৃষ্ণার্ত ময়ূর উড়ে যায়। টাঙ্গোঘোড়া চালিয়ে চটজলদি পাহাড় ডিঙিয়ে যায় গুজার ছেলেরা। মনে পড়ে যায় ভারতযুদ্ধের কথা - দ্রোণাচার্য, দুর্যোধন, কপট চূড়ামণি কৃষ্ণের কথা। মিল খুঁজি দুধা সিং, দিগ্বিজয়, কিষণ লালের সঙ্গে। চূড়াদের ছেলে মন্নু আর দুধা সিংয়ের নাতনী মহিষ তাড়িয়ে নিয়ে পাহাড়ের দিকে যায়। আর ফেরে না। দুধা সিংয়ের পহেলবান বন্দুক চালায়। রাতভর দুটি নবীন- নবীনা কাশবনে পড়ে থাকে - -

১১.১০.২০০০, বুধবার .....৬.১১.২০০০, সোমবার

একদিন দুধা সিং বল্লেন - "আজ রাত- কো আনা, ভঁয়সা- কা- নাচ দিখাউঙ্গা - "। মধ্যরাতে মহিষের থান- তবেলায় গিয়ে দেখি, খুব হুইস্কি খাওয়ানো হচ্ছে মহিষকে আর নেশার ঘোরে নাচছে মহিষ। এইভাবেই উত্তেজনা বাড়বে এবং দ্বিগুন দুধ দেবে। কোথা থেকে একটি চামার লোক এলো, সে গান ধরল - "আয়ে কা হর্ষ নাহি, গয়ে কা শোক নাহি, অ্যায়সা- হি ধরম হ্যায়, শোচনে কা বাত হ্যায়।"

আবার অজিতের খত্ এলো : "কি হলো ? কবে পাচ্ছি পাণ্ডুলিপি ?"

বুকে ডুগডুগি বাজে। কি পাঠাব ? কিছুই লেখা হয় নি। কোন ছকই করতে পারছি না। যাদবদের বিলাস- বিস্ময়, আচম্ভা দ্বাপট, কিছুই জানা হয়নি। যত দেখছি চিন্তাগুলি দলা পাকিয়ে যাচ্ছে। একটা মানুষ ছুটছে মরুমাঠে, পিছনে অজস্র ছায়া- ছায়া মানুষ। না। ঘাঁটিবস্তি ভাঙা হচ্ছে। গুলি চলছে। না, না। এক শত মহিষের থান- তবেলা এবং তাউ দুধা সিংকে নিয়ে শুরু করলে কেমন হয় ? অনেকবার নানাভাবে শুরু করা হল, কাটাকুটি হল। মন- মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। অনেকের সঙ্গে

মনমালিন্য হল। ঘরে এবং বাইরে। কেউ জানল না কারণটা কি ? স্নায়ুদৌর্বল্যের ফলে মাথায় প্রবল যন্ত্রণা, অধিকন্তু হঠাত- হঠাত ঘাবড়াহট্। মাথার তালুতে জ্বলন। কলম হাতে নিলেই ঘোলাটে হয়ে যেত চোখ। নিজেকে খুব ধিক্কার দিতাম। দগ্ধ দুপুরে . . . . . .
হঠাত- ই একদিন রুগ্ন দুর্বল অস্তিত্বকে নাড়িয়ে দিল তাউ দুধা সিংয়ের হরষিত মুখখানা - আর গীতের ধ্বনির মত নখর বাক্যটি -

"ওয়ঁ হোয়ঁ, ঝুমকা ঝুলথ রে - - "

অধিকন্তু, নবীনা মহিষটির স্থলস্তন ও রাধাবাঈয়ের উভরতা উরসিজ . . . . . .
সে বড় মজার সময়, বিষন্ন রক্তের দাগ মুছে ফেলে আমি এইভাবেই লিখতে শুরু করি :

অথ সৃষ্টিপালা আরম্ভ

_____কাব্যডায়েরি_____

দেবযানী বসু

দূরদর্শনের ক্যাথিটার খোলা সময়

২৫ ডিসেম্বর, ২০১০ সকাল ৮

গ্রামের দুধ শহরে এসে কেক... কেক আর কফি অভিনন্দন জানাল । শিশিরের অযাচিত ইশারায় ঘাড়লম্বা জুতোরা ছোটাছুটি করেছে অনেক। সিঁড়িতে ঘোষণা আর এষণা... চোখে ভাসছে ট্রেনের তারে ফিঙের খবর টাইপিং। ফিঙের সুঠাম বাইসেপ। খেলতে আসা পাখিদের ঠোঁটে আগাম বায়না বোনে জল মাটি হাওয়া। কি আর কহিব আমি জীবনে মরণে জনমে জনমে খতরনাক হইও তুমি... সীমিকা সংলাপ

গুছিয়ে নিচ্ছি ব্যাগে শীতকালীন রঙিন পালক যা দিয়ে শরীরের শুশ্রূষা হবে। চেয়ারকারে ডোবারমাছ ঘেউ ঘেউ করছে। এখন স্নান ঘরের পর্দার ধ্যানের সময়। জানিনা দিনটার গান বেশি কথা কম শেষ দিকটাকে ঘোলা করে দেবে কিনা। আসলে ছুটবে তো টোলবুথ মন্দির ... নদীর ইনডোর তরঙ্গ... নাবালক জমি পেরচ্ছে খ্রিসমাস ট্রি। ঘুমিয়ে পড়লে মনতাস সাফল করছে কেউ। বারোলাখ ভূতের জিগমিষা. .. ইড়ার রক্ত পিঙ্গলায় চালান. . .

দুপুর ১

লিখব বলে বসতেই ডোরবেল। বেরোবার তাড়া। ওহ একরিয়ামের ছেলেটি বুঝে নিতে এল। এরপর বিখ্যাত ঘড়িটির গলন্ত সময়ের কাছে সমর্পিত করব নিজেকে। এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর... মাছের জন্য রাত্রি আনতে হবে। ধাবার গোলাপ জাম উবু দশ কুড়ি ... নিশ্চয় কমলালেবু গড়াতে শুরু করেছে কোষে কোষে ... দলা দলা মেমব্রেনে... মিনি জেমিনি যামিনী... আহ সারারাত ট্রেনে... ঐ পথে যৌনতার ক্রমোন্নতি হবে. . . ।

২৬শে ডিসেম্বর দুপুর ৩

পাঞ্চুয়াল ভূমিকম্প..... আসুরিক টুথপেস্ট... কাত হয়ে আছি দরজার তালার কাছে। ভোরে হাড়ের সঙ্গে মোকাবিলা করেছিল শীত যা সুপর্ণার জল হাওয়ায় বেড়ে ওঠে চিরকাল। ভোরের খেজুররস... খেই হারানো আনন্দবর্ধনের... আর অসামান্য তমসার তির... আমরা সহস্র গোপিনীর খোলস ত্যাগ করে সাপ হয়ে যাওয়া দেখছি। স্টেশনে চব্বিশ ঘণ্টার চা... ঘেঁষাঘেঁষি থেকে খর খর মুখর মুখের বাস্প হাওয়ায় মিশছে । কুয়াশার উপাংশুকথন. . .

গম্ভীরমুখের মেলট্রেন ...মহামেলা মহাজন . . . . . রমণপথ . . .

রাত - ১১

কিছুদিন আগের ঝগড়া মর্ম রাঙালো । ব্যাগে ব্যাগে ঠোকাঠুকি । বাউল বুড়োর মাথা যন্ত্রণা । এবার থ্রম্বফব। আর ধ্বনিচিহ্ন টেপাটিপি. . . সন্ধ্যার প্রিয়াল ... সঙ্গে আম লেবু আর হাঁস মুরগি... সাবিত্রী সত্যবান পুতুলখেলা। উঃ এত ভিড় । নাগরদোলা চড়লাম। সত্যি চুমু আর জড়াজড়ি ... বার্ধক্য আছে তাই গ্যালাক্সির পর গ্যালাক্সি পার হতে হবে। মেলার প্রান্তে শুঁটকির মেলা। মুখোশের ভয়ে ঘুম আসছে না। হৃদমাঝারে রাখিব ছেড়ে দিব না। স্নান পান গান. . .

গানের তরী একা ভাসানোর দায়িত্ব আমার নেই । রাতপাখির ডাক একটানা হয় না। সকালের পুজোটাই আসল পুজো। আমি তো ভূত নাচাই আবার ওঝাও নাচাই। দুটো নাচের তাল ভিন্ন। বেবি একতারার টুং টাং ... সে ফুল ঝরায় ... তারা ঝরায়... ম্যাগদালিনের চুমু ঝরায়। এই কাল ও কালো পুরুষটির থেকে বিরহের নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসছে। তিমির ঘুমন্ত চোখে মুখে ঘুম তিমিরপক্ষ. . . . .

২৭ ডিসেম্বর, দুপুর ১২

মোচড়ানো গলার পাখিরা সকালের ঘুম ভাঙিয়েছে। আমাদের দেরিতে ঘুম ভাঙল তবু। জল থাকুক তরতরঙ্গ... সকালে আমরা জলের কাছে গেলাম। জলের পছন্দ জানি প্লাটিনাম পোশাক । পিছন দিকে হাঁটা বাঁদরদের শহরে প্রবেশ। শরীর ছিনিয়ে নিচ্ছে চারসারি রিডের হারমোনিয়াম। এই কঙ্কাল নিলামে চড়লে কত্তো দাম হবে . . .

শাল মহুয়ার নিচে এক ছটাক নির্জনতা ছিল । প্রাণীদের গাছ ভেবে কতবার প্রেমে পড়লাম তোমার। ধ্যানভাঙানিয়া মোবাইল মাঝখানে প্রীতমকে টেনে নিয়ে গেল। গাছের নিচে বসা হল না । হুলাপার্টি জলে তরঙ্গ তুলছে দক্ষিণ ভারতীয় গানে আখ্রি পোড়ে সাদা মোটরবোট হংসমুখ নিয়ে কাছে এল। দূরে জিরাফের গলায় ঝোলানো সেতু। মরালের ডানা মেলা শয্যায় অ্যানোড ক্যাথোডের ছড়াছড়ি। খোলামেলা পাঁচ ডিগ্রির হিমেল উত্তাপ ... সখী লীলায়ন কারে বলে ... মহুয়ারসের আনমনা এতসবের পরেও প্রচ্ছদ জন্মাল ও টি রুমের স্বীকৃতি ছাড়াই। তোমার ঝিলে কোন পাখি নেই আর আমার ঝিলে... সব বুকওলা ।

মায়াবী গাছেরা কেন মুক্তা ছড়াল পথে। মুক্তা তো বর্ষাকালের জানি। বর্ষা ও মুক্তার সমকাম কে দিয়েছে আমার অনলাইনে জানতে চাইনি। আমি বাসের কাচে ধানক্ষেত আঁকলাম। আর বাসের কন্ডাক্টর ফোনে রেডিওকার্বন ডেটিং করছিল। পাছে প্রমাণ থেকে যায় তাই কাজু বাদাম কেনা হল না। হাজির থাকলেও তা জাহির করা

চলবে না ।

২৮ ডিসেম্বর, ভোর ৪

ফুলজানি ফুলজানি ফুলজানি... এটা তো আমার যোনির নাম ... কাল রাতে চিবুকে লিখেছ । আমিও লিখেছি রুবান... রুবান... জিন্দেগি নাম হ্যাঁয় কুছ লমহোকা ... বাঁকে বাঁকে জন্মানো U বাঁক কবিতা একঝাঁক। সঙ্গীনির্ভর বাগিচা ... সমস্ত ননজিরো হ্যাঁ ও না এর যা নিয়ে উপছে পড়ছে রাগ। শুনছি ম্যাজিক মোমেন্টের কবিতা...তার ব্যক্তিগত সহবাস ...রিখটার স্কেল ভাঙা ... ফির ভি একরাতমে শও তরহকে মোড় আঁতে হ্যাঁয়... অনেক মাহুতপ্রিয়া কাঁদছে বাউলবুড়োর জন্য। সে টলছে ... ছটফট করছে ... রেগে মুতে দিচ্ছে টেবিলে রাখা আমার পোশাকে ... দেয়াল হাতড়াচ্ছে ... আমি উঠে আবার শুইয়ে দিলাম বিছানায়। আআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআ এত মাকড়সা কেন সারা ঘরে . . .

দুপুর ১২

দইয়ারে দইয়ারে ছেড় গ্যয়ো পাপী বিছুয়া...পশ্চিমবাংলা থেকে মাত্র পাঁচ হাজার কিমি দূরে হাজার হাজার সূর্য উঠেছে । বলিষ্ঠ প্রণামের ভিতর আমি হারিয়ে যাচ্ছি । যোগ বন্ধু আসনকে পথ, পথকে আসন বলে অট্ট হাসিতে নিজেকে ভাঙলেন । তারা চেনাতে আজ সন্ধ্যা আসবে। খড়ের সিংহাসনে রাজাকো রানিসে... কেউ বুঝছে না সকালের দইতে ঘোড়াবোঝাই ট্রাকেদের ডাক কিভাবে মিশেছে । যোগপাগলা বাবা মায়ের মিলিত বিন্দুতে অনিমা. . . . . .

সেকেন্ডহ্যান্ড স্কুলবাসদের ধর্মঘট । আমরা ট্রেকার পেলাম না । দেশি টোকো মদের গন্ধ আমার শাল সোয়েটারে । অসমাপ্ত বাবরনামা চোখের পাতায় বিপদসীমার উপর দিয়ে রোজ জল বয়ে যায়। গোল গোল ফুল আঁকা কুটীর দেয়াল। আর কতো পথ যাবো ... কঙ্কালের পাশ ফেরার শব্দ পাতাল অব্দি ছুটে যাচ্ছে । এবারের বৃষ্টি নিম্নচাপ... বাঁ হাতি গিটারকে ডান হাতি করে ছাড়বে। পাশের জনকে মনে করিয়ে দিলাম কাঠের মালা আর স্টিলের ক্রস কিনতে হবে।

২৯ ডিসেম্বর সকাল ১০

উলিয়াম (উইলিয়াম) বন্যসুন্দরটির নাম। আসলে আমি যখন খাতার পাতায় অদ্ভুত উপাদান নিয়ে কণাদের ঝঞ্ঝাট ভাবি তখনি ও একটা শজারু শিকার করে আনল । বিছানা আলোকিত করে আছে বোল্ডারস এন্ড ব্লেন্ডারস প্রাইড । আপাতত জটিল রেসিপি খুলে সরল রান্না করতে হবে। রেসাস বাঁদর কিছু দূরের ডোরাকাটা গাছে। আহা ছোট্ট নদীটি পটে আঁকা ছবিটি ... নারকোলের টুকরো খেতে গিয়ে বাউলবুড়োর হেঁচকি উঠছে । আমি গঙ্গোত্রী পাশে দাঁড়িয়ে । কাঁচা মোজা ঝুলছে ফাঁসিলাগা বেড়াল। এ গ্রামের বালিকা পুকুর এখন মিনাতালাও । মরে নি। জলহাওয়া পেয়ে সুইমিংপুল। হেঁচকি বদার করছি না । ভারতের ছুটির দিনগুলো সোনার খাঁচায় থাকার জন্য কি... মোবাইল খুলতে গিয়েও খুললাম না শর্ত আছে। বেরিয়ে যাবো এই বনবাস ছেড়ে আজ।

উলিয়ামের পিতা পিটার । পিতা। জলভাতের সরলতায় মণিরালয়ের সব চাবি মুখস্ত তার। আর প্রাঞ্জলতায় কবরের মোমবাতি ঝেঁটিয়ে তোলে। উইলিয়ামকে ডাকে উইলি... স্রেফ বাঁড়া... তারও অথর্ব পিতার পরিচয় দেয় আর বেড়ে যাওয়া প্রস্টেটকে মাই এর সঙ্গে তুলনা দেয়।

রাত ২

একা আবার। নিষিদ্ধ বাসটির গান ছিল ধড়কন ফিল্মের রতিমন্থিত ... সুন্দরী কমলা- সুপুরি গাছের যৌগিক কামসূত্র... গোমড়ামুখো সময়কে গানওয়ালার থেকে ছিনিয়ে নিলাম। আমাদেরকে অনেকক্ষণ সময় দিয়েছে হরবোলা পাখি একটা। ধমক দিচ্ছে নদীটাও ... এমন কিছু জীবন না তবু আত্মকাহিনি লিখতে হবে। আপেলিয়া চুমু শেষ হল রাত ১২ টায়। নিম্নচাপ আর শীত গড়িয়ে ডিভানের কোণায় আটকেছে। শহরের গলায় অম্লান ঝাউপাইনের মালা। মোবাইল খোলা হোক ... যে জন প্রেমের ভাব চিনে নাআআআআআআআ তার সাথে নাই লেনাদেনা । এখন দূরদর্শনের ক্যাথিটার খোলা সময়... খবর কাগজের কাক তৃতীয় বর্ণে বসে কাগ আর পেজ থ্রি ডানায় উড়ছে মাথার উপর। কাকেদের অশৌচ পালন করতে দি। গানওয়ালা... আমার আর কোথাও যাবার নেই বলে একটা পাথরকুচি জুতোর ফাঁকে লুকিয়ে . . .

low light lit little tick flea

migrant sip pissy wit twill twill

low will piano frill label
slain hero

palo o opal laughing
harrow

barracuda amour our
radio crash

কবিতা পাঠ : কার্লা হ্যারিম্যান

_____ইংরেজী কবিতা_____

DILIP FOUZDAR

PESHAWAR

Great fun us children in the school hall and sudden strangers with Kalashnikovs
As if we don't know those toys or don't dream of wearing it one day
But it was fun seeing instructors shifting attention and we went on passing messages
among ourselves.
Was it not some kind of a sin that we don't learn instead

It was us in the class! And how it all turned into events like the morning newspaper
Or a boring BREAKING NEWS interrupting Cricket
And my teacher was crying to herself yet we left her alone and ran – she said so through her eyes
But then we saw her being burnt and guilt haunting for the split of a second
And disappeared, there were dead bodies of friends all over and guns with Hawk eyes all around
And it was fun they can't hit so many we went on stealing their seconds amidst crossfire
Although we never knew the school gate could be that far
And we knew they are there and it was fun seeing them defeated with forefinger on trigger and
Loaded guns on their side

And it was fun seeing papa at the gate and ma hiding behind, crying.

_____অনুবাদ কবিতা_____

ALLEN GINSBERG : PSALM IV

অনুবাদ : দিলীপ ফৌজদার

ঋক্ - ৪

অতঃপর আমি আমার লুকোনো অন্তর্দৃষ্টিকে, ঈশ্বরের মুখ: এই অসম্ভব দৃশ্যটিকে লিপিবদ্ধ করব
ওটা কোন স্বপ্ন ছিল না, হার্লেমে, শুয়েছিলাম মস্ত একটা পালঙ্কে
হস্তমৈথুন চলছিল ভালবাসা ছাড়াই, আধা ন্যাংটো, অবশ্যই কোলের ওপর ব্লেক এর একটা খোলা বই

পশ্য পশ্য ! আমি ছিলাম ভাবনাশূন্য একটা পাতা ওলটালাম আবার জীবন্ত সূর্যমুখিটিকেও দেখে নিলাম
এবং একটা গলার আওয়াজ পেলাম, ওটা ব্লেকের ছিল, জাগতিক কিছু আওড়াচ্ছিল
আওয়াজটা পাতাগুলোর থেকে উঠে এসে আমার কানের মর্মে চলে গেল - আগে কখনও শুনিনি এমন-
চোখ তুললাম জানালায়, বাইরে বাড়ীর লাল দেওয়ালের ঝিলিক
সীমাহীন আকাশের করুণ অনাদিত্ব
রোদ চোখ মেলে আছে চোখ বিশ্বময়, হার্লেমের বাসাগুলি দাঁড়িয়ে আছে
অন্তরীক্ষে - - -
প্রতিটি ইঁট প্রতিটি কার্নিস বুদ্ধিমত্তার ছোপ লাগা যেন বিশাল জীবন্ত একটা মুখ
মস্তিষ্ক বিশাল হয়ে খুলে খুলে আসছে রুক্ষতার মালিন্যে! -এখন গলা চড়িয়ে ব্লেকের গলায় কথা বলছে
ভালবাসো! তোমাদের ধীরস্থির উপস্থিতি আর শরীরের হাড়! পিতা! আমার অস্তিত্বের ওপর
আপনার সাবধানী পাহারা আর প্রতীক্ষা!
পুত্র! পুত্র আমার! অনন্ত সময় আমাকে ডেকে যাচ্ছে! পুত্র! পুত্র আমার!
সময় একটা যন্ত্রণার তাড়না আনছিল আমার কানে।
পুত্র! পুত্র আমার! পিতা আমার কেঁদে উঠলেন আর আমাকে জড়িয়ে নিলেন নিজের দুই মৃত বাহুতে।

গৌতম দাশগুপ্ত : নস্ট্যালজিয়া

Translated from the original Bengali by Gautam Dashgupta

NOSTALGIA

Homeless skywalker mindfan on afternoon poppy field
Creates format of French connection
Kochida’s firework zooms high
We are trained to molest cigar and brown sugar to lick sex utthapam
Talkyshow legpiece with bellbottom floating on Fariapukur
As if watery Venice Christeen killer walking down Sodepur memory lane
Brahmananda claw signals Delhi still burns

গৌতম দাশগুপ্ত : ম্যাগনোলিয়া আইসক্রিম

Translated from the original Bengali by Gautam Dashgupta

SCORCHING NOON

Tiptop restless figure now started dismantling
Nobody hello you skinless skull
Chamba after deforestation bridge nearer and friend befriends
Oh ! Bygone those days
Ah ! that hilly boob or that brown dame from Patna
Our hide and seek between sunrise frill and sunbeam bellbottom
From their perforation pirating music pour
No buck no luck then suck and fuck
Lomraj uncle's explore store exposes fumbling rectum of Rohtang Pass –
I don't know why retired Bush never retire with Mesopotamian excursion
Hillary feels drenched watching Obama's bald
It is as if watching bull in stock market
I.T. leg chewing fellow CTM or PTM unaware Chidambar Parlour
Toothless uncle hugs braless teen to death
Investigating man silent idol
All these scoops they are globalization or spine stamina at this juncture
Drip has no color
Snatching paper whistleblower fumes
One eyed dumb have glam-sexy-mistress throughout the globe
Drip in hand everything vanishes
Restless smile of peace loving Manmohan
Arushi's death compromising or objectionable everything vanishes
Fading glucose only at that foggy bend of sleep and sleeplessness
Magnolia ice cream vendor sucks eyeful water of a teenage girl with no antecedents
Under scorching noon

দীপঙ্কর দত্ত : ফেরা

Translated from the original Bengali by Dipankar Dutta

RETURN

Snakes ordain
dawnful Nayantara's flooded rascal red sets illuminating
haunted house hasnu you stay beaming always

treasure guarding yakshini crescent-viper’s ancestral muthoots gush forth on threshold cracks
rapt cloud-brats are awed guardians called in
dropping out hell heaven dual citizenship in spells on iPod oblivion
pulled hamstring during practice session a thousand-door mud island window roars attam
on popping lonavala rain crease
of sullied mohini
beach volleyball player's doggy style snoozing on narghile tube
Nayantara returns to team crumpled modesty lash green stola –

“I'm looking for what might be called a body language. One thing I do is stick a vibrator up my cunt and start writing — writing from the point of orgasm and losing control of the language and seeing what that's like.”
— Kathy Acker

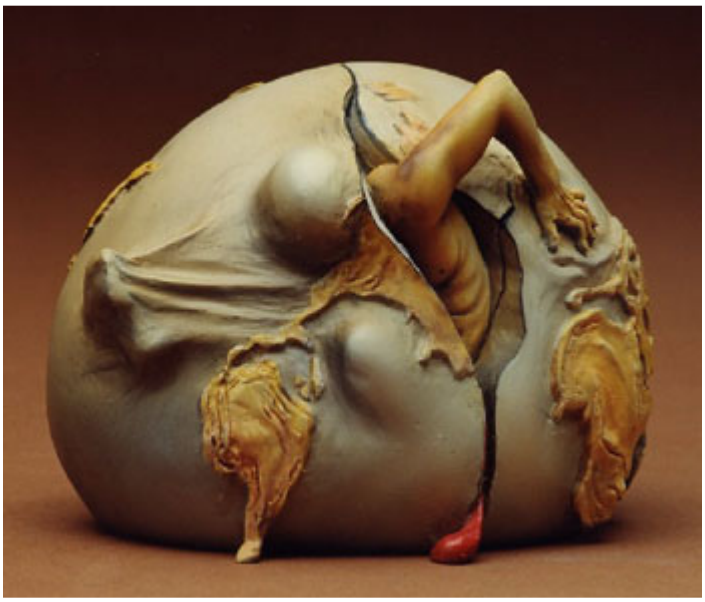

উৎপলকুমার বসু- র কবিতা

নাইট স্কুল

গোল হয়ে বোস তোরা, আজকের ক্লাস অন্যরকম, সান্ডেলদের
ছোট ছেলেটা এসছে তো, এই তুই এসচিস না এসিসনি, হাঃ হাঃ ,
শোনো কথা, বলে কিনা আমি এসিনি, কিন্তু তোর গলা কি আমি চিনি নে
রে, আগরওয়ালাদের রোগা মেয়েটা আসবে না খবর পাঠিয়েছে, রোলকল
হবে, দু- মিনিটের মধ্যে, তারপর কলা আর পাঁউরুটি, তারপর
আজকের বিশেষ অতিথি, যিনি কষ্ট করে এদ্দুর এসচেন, এখন বাথরুমে,
তিনি কিছু বলবেন, তোরা গোল হয়ে বোস, কিন্তু ঝগড়া করিসনি;
এই বাড়ির মালিক বটকেষ্টবাবুর মা- র বড়ো অসুখ, দোতলার ঘরে
রয়েছেন, চিৎকার- চেঁচামিচি শুনলে স্কুল বন্ধ করে দেবেন, না না, মা
কিছু বলেননি, বলেছেন বটাবাবু, ওঁর ভাই গিরি নজর রাখছে, সে- ই গিয়ে
দাদাকে লাগায়, চুকলি কাটে, আর বাইরে, আমাদের সামনে, বড় বড়
কথা, শিশুই জাতির ভবিষ্যত, শিশুদের গড়তে হবে, আর ছাদের
এই কোনাটুকু হপ্তায় তিনদিন, তাও সন্ধেবেলায় ঘণ্টা খানেকের জন্য
ছেড়ে দিতে ওনার বুক ফেটে যাচ্ছে, কলার
খোসা এই ঝুড়িতে, পাঁউরুটির গোড়াসুদ্ধ খাবি, অনুপস্থিত পাঁচ, উপস্থিত
তের, এই সান্ডেল তোকে প্রেজেন্ট দোবো না অ্যাবসেন্ট দোবো, আকাশের
দিকে হাঁ করে কী দেখছিস, মুখের নাল মোছ, ঐ যে উনি আসছেন,
শিক্ষা আধিকারিক (সহকারী) , সল্টলেকে বসেন, সোমেন বাবু,
সোমেন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রোমোটেড আই এ এস, রিটায়ারের
ছ- বছর, বেলেঘাটায় বাড়ি, মেয়ে দিল্লিতে, বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলে
আসামের চা- বাগানে, নিজের বলতে এখন শুধু হাঁপানি আর আলসার আর
ইউনিট ট্রাস্টে কয়েক লাখ, মেডিক্লেম, আর শরৎ রচনাবলীর ডিউ
ছ- টি কুপন, গিন্নির চোখের ব্যারাম, আসুন, আসুন, এই মাঝের চেয়ারটায়,
হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসুন, এই এগিয়ে আয় না, সার- কে এক গ্লাস জল দে,
না খেলেন, টেবিলে ঢাকা থাক, চা- টা ক্লাসের পরে হলে অসুবিধে নেই তো,
যদি চান তাহলে ক্লাস চলাকালীনও
উনি বাঙালি নন

উনি লালা, অবোধ, বাঁকেবিহারী, ভরদ্বাজ, দ্বাদশবেদী, উনি নাহার (মানে নেহেরু,
যুগযুগ জিও), উনি সাগর, উনি গিরি, উনি কেন্দুপাতা, উনি লোহিত,
উনি হাতি সিং, উনি বাঘনখ (আফজল- পূর্ব), উনি চিৎপাবন (গোখলে গোষ্ঠী,

যুগ যুগ জিও), উনি রউনাক, উনি যাদব, উনি ঠাকুর, উনি সিনহা,
উনি পটনায়েক

বস্তুত উনি বাঙালি

বা আরো বেশি ফ্রম মাইমানসিনহা, পূর্বপুরুষ ছিলেন পাহাড়ে বাঙাল
ভাগচাষী, বেগুনচাষী
সম্প্রতি উনিই যুক্তাক্ষর- বর্জিত সেই বইটি লিখেছেন, ওর স্ত্রীর পৌনঃপুনিক মন্তব্য
হক্কলের লাইগ্যা ভাইবা ভাইবা উনিরে বইখান ল্যাকচেন, বই তো নয়
যেন কাঁটা বেগুন, কুলি বেগুন, মাকড়া বেগুন, নুড়কি বেগুন, মুক্তকেশী, আউশা,
গোষ্ঠ (ওরফে মার্বেল), এ হল গিয়ে দাদা- ভাইয়ের দেয়ালা, গলায়
ঝুলছে আমলা রাজনীতি ও সরকারি- তেজপাতার মালা

তাও লোকে বিশ্বাস করে না
বলে কন্ঠী কোথায়, পার্টি কার্ড দেখা, পার্টিশনের আগে না পরে

(পূর্বপ্রকাশিত)

মলয় রায়চৌধুরী- র দুটি কবিতা

অবন্তিকা, তোর ওই মহেঞ্জোদারোর লিপি উদ্ধার

কী গণিত কী গণিত মাথা ঝাঁঝা করে তোকে দেখে
ঝুঁকে আছিস টেবিলের ওপরে আলফা গামা পাই ফাই
কস থিটা জেড মাইনাস এক্স ইনটু আর কিছু নাই
অনন্তে রয়েছে বটে ধুমকেতুর জলে তোর আলোময় মুখ
প্রতিবিম্ব ঠিকরে এসে ঝরে যাচ্ছে রকেটের ফুলঝুরি জ্বেলে
কী জ্যামিতি কী জ্যামিতি ওরে ওরে ইউক্লিডিনি কবি
নিঃশ্বাসের ভাপ দিয়ে লিখছিস মঙ্গল থেকে অমঙ্গল
মোটেই আলাদা নয় কী রে বাবা ত্রিকোণমিতির জটিলতা
মারো গুলি প্রেম- ফেম, নাঃ, ফেমকে গুলি নয়, ওটার জন্যই
ঘামের ফসফরাস ওড়াচ্ছিস ব্রহ্মাণ্ড নিখিলে গুণ ভাগ যোগ
আর নিশ্ছিদ্র বিয়োগে প্রবলেম বলে কিছু নেই সবই সমাধান
জাস্ট তুমি পিক আপ করে নাও কোন প্রবলেমটাকে

সবচেয়ে কঠিন আর সমস্যাতীত বলে মনে হয়, ব্যাস
ঝুঁকে পড়ো খোলা চুল লিপ্সটিকহীন হাসি কপালেতে ভাঁজ
গ্যাজেটের গর্ভ চিরে তুলে নিবি হরপ্পা- সিলের সেই বার্তাখানা
হাজার বছর আগে তোর সে- পুরুষ প্রেমপত্র লিখে রেখে গেছে
মহেঞ্জোদারোর লিপি দিয়ে ; এখন উদ্ধার তোকে করতে হবেই
অবন্তিকা, পড় পড়, পড়ে বল, ঠিক কী লিখেছিলুম তোকে- -
অমরত্ব অমরত্ব ! অবন্তিকা, বাদবাকি সবকিছু ভুলে গিয়ে
আমার চিঠির বার্তা তাড়াতাড়ি উদ্ধার করে তুই আমাকে জানাস

কেম ছে ? মজা মা !

সত্যি দেখলুম পালাচ্ছে এক- মিছিল বাঁটকুল মানুষ
উদোম মহিলাদের গা থেকে ঝুলছে ন্যাতানো লিঙ্গ
খোসাখোলা মেরুন লিপ্সটিক গোলাপি লিপ্সটিক
শামুক- চাটন লালা ইলশেগুঁড়ি টাইপের
কালো ধলা তামাটে হলদেটে কচিকাঁচা- মানবীরা
'সেলাম ঠোকো' বলতেই খট্টাআআআআআস
উঠে গেল তুঘলকি পতাকাগুলো পত- পত
তারপরেই নতমস্তক ঝুপুসসসসসসসসস
পুরুষদের শরীরময় চোক- পিটপিট যোনি
কনট্যাক্ট লেন্স মেলে রোদ ঢাকতে
স্লোগান দিচ্ছে বন্ধ হচ্ছে স্লোগান দিচ্ছে
বন্ধ দরোজা খুলে উড়ে উড়ে দাঁড়কাকের
ইয়াআআআ লম্বা জন্তরমন্তর থেকে এগিয়ে
রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ সবাই
গা থেকে লিঙ্গ আর যোনি খসিয়ে জমা দিলেন
হেডকোয়ার্টারে যে যার নম্বর মিলিয়ে
জিপসি গাড়ির মিছিল- ড্রাইভার হাইতোলার
পেটেন্ট বিক্রি করতে মফুসসুলে গেছেন
ফিরে এলে নিদেনপক্ষে মরামাংস খাবেন
বাঁদর শুয়োর বনমানুষ বাচ্চা- বাইসন
মিছিলে মিছিলে কচ্ছপদের কুচকাওয়াজ
তখন তাদের পিঠে মানুষদের নম্বরগুলোর
স্টিকার লাগানো হয়েছে দাম সবায়ের ফিক্সড

এফিডেভিট দিয়ে লিঙ্গ আর যোনি ফেরত পেলে
ভার্জিন কিনা যাচাই করে পাল্টা মিছিলে ছাড়া হবে

অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়- এর তিনটি কবিতা

দ্য ডগ ইজ ড্রিমিং - ১

কুকুর কি ঘুমাইয়া আছে ?
আমরা কি সঠিক জানি কুকুর কোন স্বপ্ন দেখেনি এযাবৎকাল।
ওর গাত্র হরিদ্রা, জিহ্বা রসালো ও পুঞ্জিভূত
লালসা সারস বেগ ন্যায় ধাবিত মনুষ্য দুয়ারে
করোটিতে ধর্মবোধ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ কই
বালিতে গোল করে এঁকেছে স্নেহ আর
স্নেহ থেকে বারবার ছিটকে পড়েছে

কুকুর যদি ঘুমায়, তবে কি আমরা পাশে শুতে পারি
চাঁদের দিকে মুখ তুলে সমবেত দেখতে পাই
রাবণের চিতার কাছে নতুন কাঠের যোগান
টেবিলে কাঁচের গ্লাস, ভেজানো সবুজ মুগ
যেন কেউ খেলতে যাবে
আমরা কি সঠিক জেনেছি সারমেয় স্বপ্নে
ড্রপ খায় না ঘরকাটা ফুটবল . . .

দ্য ডগ ইজ ড্রিমিং - ২

পিত্ত জনিত সবুজ বমির পর কুকুর বিশ্রামরত।
জেল সংশোধনাগার হতে আততায়ীর সহিত দৃষ্টি বিনিময় পদ্ধতি নির্বাচন এবং হাত বিশেক এগিয়ে নতুন স্থান দখল করে কুকুর।
এই দন্ডে তার কূলকুণ্ডলিনী জাগ্রত। আততায়ীর বংশ পরিচয় আদি কৃষিকাজ। কৃষককূলকে ঘেন্নার চোখে দেখে কুকুর।

সিগারেট ধরাতে গিয়ে মনে হল ওর গায়ের রঙ মুখে দিয়েছি।

আগুন যত এগিয়ে আসছে ঠোঁটে জাগ্রত হয়ে উঠছে কুকুর।
প্রতিকার স্বরূপ চায়ে ডুবিয়ে ভেজা পাঁউরুটি বোলাই

নিজের ছায়ার তলায় শান্তিতে দুদন্ড বসি
কাছাকাছি কোথাও গাছ নেই - স্বপ্ন দেখার স্থান নেই
যেদিন পূর্ণিমা
জানালার নীচে কুকুরের গা থেকে ক্ষীরের গন্ধ পাই সারারাত . . .

দ্য ডগ ইজ ড্রিমিং - ৩

রাজার মুকুটের ভিতর ঘাপটি মেরে বসে থাকার পর
ভ্যাপসা হাওয়া নুন ও অপসৃয়মান কেশ থেকে
লাফ দিয়ে দরবারে নামলো কুকুর
প্রাণ ভরে অক্সিজেন সেবন শেষে - মানুষের দিকে
মুখ তুলে দিয়ে গেল রাজার রেশন কার্ড
সেদিনের বিপ্লবঘন মুহূর্তে কেউ বোঝেনি
মুকুট থেকে রঙ নিয়ে চলে গিয়েছিল কুকুর। চিরতরে।।

স্টিল থেকে কাঁচের গ্লাসে ঢালা হয় চিরতা জল
এভাবেই প্রিয়জন বাড়ি পাল্টায়, বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়
হাত ভাঁজ করে নিজের মাংস কামড়ে ধরে
এবং জল ও মাংসের কাছাকাছি গড়ে ওঠে কুকুরের বাড়ি ।।

কুকুর কি সত্যিই একদিন শেষ আগস্টের হাওয়া থেকে আমাকে সরিয়ে দেবে ! ঠেলে
দেবে হোটেল ঘরে ! আর আজান মুখে ধরে মধ্যরাতে শাসন করবে রাজপথ . . .

অলোক বিশ্বাস- এর দুটি কবিতা

পরিবর্তন

একটা ঝগড়া থেকে আর একটা ঝগড়ার দিকে যেতে মাত্র কয়েক মুহূর্ত
এবং আলো যখন ভালো জ্বলছে তাকে অন্ধকার নামে অভিযুক্ত করা হয়

জানালার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকা রুদ্রপলাশকে
ডাইনি বুড়ি নামে চিৎকার করে ডেকে উড়ে বেড়াচ্ছে আমাদের পৌরুষ
যাকিছু বিক্রিযোগ্য নয় তাকেও বিক্রি করে বদলে দিচ্ছি গাছের সংজ্ঞা
ওই আমাদের মেজ বউ, তার দেওয়া কলসির জল আর শীতলপাটি
শূয়রের মুখ থেকে অন্য শূয়রের মুখে হারিয়ে গেছে তর্কেবিতর্কে
তুমি যাকে কুসুম বলো লোকে যাকে হৃদয়পত্র বলে সেই ঘরে মজা মারছে ক্লাউন
মৃতদেহগুলিকে শনাক্ত করেও গ্রহণ করতে পারলাম না নিজেদের লোক বলে
জামার পকেটে লুকিয়ে আছে বিস্ময়কর অপরাধ, হৃদয়ে জন্মেছে বাঘ
সমস্ত পদবীর পেছনে বসে থাকা পুরোহিত কলকাঠি নাড়ছে রঙের ।
রঙ নিজে আর রঙ নয়, অন্যরা যা বলবে সেটাই নিসর্গ দেখাবে ।

অতো না আর্ত

তুমি এক স্বপ্ন থেকে আর আমি এক স্বপ্ন থেকে বেরিয়ে এসে
মিলিত হলাম, তখন বর্ষা নেমে এলো
আমাদের সেই স্বপ্নের ট্রান্স বর্ষার জলে ধুয়ে যাচ্ছে
অথবা সেই ট্রান্স, বর্ষাঋতুর কাছে বসে ঘনীভূত হয়ে ওঠার প্রার্থনা
নিবেদন করছে ।
সেই মধ্যবর্তী সময়ে ঠিক কী ঘটেছিল মনে না থাকলেও কোনো ক্ষতি নেই
আমাদের চূড়ান্তভাবে কোথাও বুঁদ হয়ে যাওয়ার কথা নয়
আমরা দেখছি হলুদ পথ ক্রমশ লাল হয়ে যাচ্ছে
লাল পথ ধীরে ধীরে কালো কুৎসিত হয়ে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে রূপকথায়

জপমালা ঘোষরায়- এর দুটি কবিতা

জাঙিয়ার বায়োগ্রাফি

একাই তো ছিলি, অনুরণন, রমণে ঢ্যামনে। অকারণ ডানাভাঙা রক্তের নুন চেটেপুটে খেয়ে তুইও চঞ্চুক্ষত হলি ?

আমার এই এত আড়াল আবডালহীন হু- বাতাসী নাকানিচোবানি আর তুই বুকের ওপর
ইঁটপাটকেলের দারুণ
মর্মব্যথা চাপিয়ে হাঁপুচাপু, ব্যাপারটা তো হরেগড়ে একই। একা একা যেমন জগাখিচুড়ির তেজপাতা, শুধু ঘ্রাণের

জন্যই ব্যবহার। লাপসে লুপসে জগা ইত্যাদি খেয়ে ফেলার পর তুইই পড়ে থাকবি তেজপাতা। এঁটো রস শুকালে
হু- বাতাসে উড়তে থাকবে খানিকটা বেসামাল ঝারুপোছা।

প্রজ্ঞাও তো খুঁজছে পারঙ্গম বীজ চেতনাকে জন্ম দেবে বলে। চেতনার কন্যাভ্রূণ চিকনি চামেলি হয়ে জিগরের
আগুনে বিড়ি জ্বালিয়ে নিচ্ছে, আর তুই যেকোনো গর্তকে যোনি ভেবে ব্ল্যাকহোল ট্রাজেডিতে লিঙ্গ ঢুকিয়ে দিচ্ছিস।

এইসব টুটাফুটা স্বপ্নের পর তুই জাগিস নি এখনো কোহলিক ঘুম থেকে। এখনো আয়নার আয়নে আঠালো উৎক্ষিপ্ত
বীর্য সেঁটে আছে। আয়না মুছিস নি। অথচ প্রতিফলিত রোদ্দুর ও লজ্জা পাচ্ছে নষ্ট জাঙিয়ার পরুষ বায়োগ্রাফি পড়ে।

ক্রাইসিস

কবি বললেন "একটু পা চালিয়ে ভাই !" আর ওরা ঝেরে লাথি মেরে দিল। এভাবেই বিপন্ন সিরিঞ্জ সম্পন্ন হওয়ার
আগেই ভেঙে যাচ্ছে। ইনজেক্ট করব বললেই করা যায় না।

স্বস্তিকা দি, তুমি যতবার গাইছো "ঝরাপাতা গো আমি তোমারি দলে... " ওরা ভাবছে বহুদলীয় গণতন্ত্রের ক্যাঁচাল।
তুমি যতবার আলো জ্বালাতে চাও নিভে যায় বারেবারে। "কোথায় গেলি বামী.... হারিয়ে গেছি আমি. . . . " এইসব
প্রদীপের আলো....নিষ্প্রদীপের অন্ধকার.... হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ এরা কিছুই বুঝছে না। বুঝছে না মেঘেদের
কান্নাহীন ব্যথা আর রক্তপাতহীন হেমাটোমার নীচে কতটা ক্রাইসিস ছিল । ওরা রঙবদল গিরগিটি আর আমরা
রঙমিশাল রঙমশাল।

মুহুর্মুহু মহাপ্রাণধ্বনিতে কত মহাওঙ্কার ধ্বনিত হল..... কত মেহ..... কত মহীয়ান মহাসিন্ধু পার হল..... একটু
পা চালালে কতকিছু হতে পারে ! আসলে ক্রাইসিসটা কোথায় জানো ? কত মোহডাক মোহনবাঁশি থেকে মোহনায়

পৌঁছোলো..... কিন্তু..... জাস্ট একটা উদাহরণ, ছেলে বিক্রম সিং খাঙ্গুরা মারা যাওয়ার পর গুরু মোহন সিং জী
আর রবিঠাকুরের নির্মোহ ভাবসঙ্গীত গাইতে পারলেন না।

নীলাব্জ চক্রবর্তী- র কবিতা

আমিলেখা

১.
জানলার অর্ধেক নিয়ে
না- ফিরে আসছে
আমাদের মেহগিনি রোদ ও পশমবিলাস
পাতা- আছে নেই
পাতায়- গুটি- গুটি- কর্পোরেট- ধরেছে নেই
হ্যালো
এখানে একটা স্মাইলি বসবে নাতো
ও জানলায় ট্রান্সফার আছে
মোমের- সেগুন- থেকে- খুলে- যাওয়া- রিপিটেশন- ছিলো
আছে
তবু লেখার পাতায় ট্রেন এলো
গুলমোহর এলো আবার
ট্রেনের পাল্লা থেকে খুলে এলো
জানলার দূর

২.
আমাতে কি ক্রিয়াপদ হোলো
নিজস্ব নিজস্ব বলছে
দুপুরকে গুণ করছে সম্ভাবনা দিয়ে
উরু আসে এইভাবে
সহাস্য জোড় এসে বসে উরুদের সাথে
লগ থেকে অ্যালগ
রিদম খুলে ফ্যালে হু হু
আর খুব থেকে যায় গদগদে রোমানো হরফ

তাকে কেউ স্তুতি বলে নাকি?
হাত দিয়ে কই হে লিরিকের লতা বলে ডাকে?

অনুরাধা বিশ্বাস- এর দুটি কবিতা

নভোনীল

দীর্ঘরাত্রিগুলি কৃষ্ণগহ্বরের মত আমাদের আলোর অভ্যেসটিকে
পরাস্ত করেছে। আকাশের অবয়ব নিভৃতিকামী একটি ধারণামাত্র।
তার অস্তিত্ব উদ্ধারে পয়গম্বর তারাগুলি অবিশ্রান্ত জ্বলে আছে

যেন জলসর্বস্ব কোন গ্রহে ছড়িয়ে থাকা নৌকোপরিবার
তন্দ্রাবিদ্ধ জেগে রয়েছে কুপির আলোয়

এই মধুগ্রামে তুমি ছিলে, ব্রহ্মের বাহন হয়ে শব্দ ছিল বনে বনান্তরে -
পাতার মর্মরে আমাদের চলাচল। পাতার স্মরণে আছে বাসনার
স্বাদু ফল আমাদের মুঠো থেকে গড়িয়ে নেমেছিল। তোমার চাঁদমুখে
তখন মনুলোকের সর্বসেরা আলো, তোমার পীড়ন ও করুণা
গোলাপবাগের আর্শি

স্মরণে রয়েছে, আর

দীর্ঘরাত্রিটি রয়েছে, সহস্র দরজার প্রতারণায় মিতবাক প্রহরীর মত।
দরজার পরে দরজা ছাড়া কিছু নেই। দেহের শিশমহলে লক্ষ কীটের
মুখ ভেসে ওঠে। লক্ষ কীটের পরকাল এতাবধি ক্ষয় ও অক্ষয়ের
দ্বন্দে দেহখানি জর্জর করেছে।

আমাদের নিত্যদিন যায় রাত্রির মাঝে রাত্রি হয়ে চেয়ে। অথচ
অপেক্ষা একটি পুরুষ্টু যষ্টির মত আমাকে পালন করে,
পালন করে আমাদের জন্মকলরবে উর্বর এই মহাগ্রামখানিকে

তোমার স্মৃতিকণিকাগুলি দেহজ কীটের অন্ন, স্মৃতিকণাগুলি মহাজগতের সুধা

মেঝে

কথাদের শ্রুত হওয়ার অভিলাষে কাগজের মণ্ডের মত পীড়িত হই
প্রবাসের গৃহচ্ছায়া সাদা ও বর্বর। গৃহপেশী কামনায় আচ্ছন্ন হলে
তোমাকে কল্পনা করি –
থমথমে উঠোনের বৈদ্যুতিন বাতিটির মত রোগভয়হীন
একা জ্বলে আছ। তোমার চিন্তাপ্রয়াসে গাঢ় হয়েছে শীতঋতু

ব্যথার শীতল জল তোমার আঁচল চুঁয়ে মেঝেময় প্রবাহে মেতেছে

অন্তর্নির্জন দত্ত- র দুটি কবিতা

জাহাঙ্গিরকে লেখা কবিতা - ২১

দুটো টানটান হিল থেকে ক্যানন
থেকে থ্রোটল্যাচ
একটা পুল
থেকে এক মাজল
হাওয়ায় সুরুয়া সরে যাওয়ার তার লরজদার বারগুস্তান

উড়েছে শিরশোভা উড়েছে পস্তুন উড়েছে শামশের
আর
যতবার তুমি ডেকেছ রাই- পিথোরা
জাহাঙ্গির
সমস্ত যবক্ষেত খুলে ডিভিডি র আলো পড়ে গেছে
রান, অফুরান

ঐ ক্ষুর ঠুকে ঠুকে নাল- অগুরু
ধুলো কুড়িয়ে দেয়
দুই পা শূন্যে তুলে তার সুর্য খেয়ে নেওয়ার নরম স্বাদ
ও
উড়েছে কেশর উড়েছে হ্রেসা উড়েছে ক্যাপুচিনো কোনো
ঠোঁটময় উপচে গেছে ফেনা

এই সায়ং - হে এই ব্যঞ্জনবর্ণে
জাহাঙ্গির এইটুকু বীয়ার শুধু আমি তোমাকে অনুরোধ করি

জাহাঙ্গিরকে লেখা কবিতা - ২২

এই যে বজর বজর করে ফুলে গেল বোরোজ
হাওয়া ফুলল তলতলে গোলানোয়
তুমি সেই মেহেদি মেখে নিচ্ছ
এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কিছুটা কাঁচা হলুদ
নিমমাখানি

বদরুদ্দিন টিপুর ছোট ছেলে সম্পূর্ণ সর্ষের তেল আনতে চলে গেছে

তবে কি হাত তুলে দিগন্তে একটু মাখাবে
গুল্মগুলোকে গরমের বালমুসিবতগুলোকে
সাবান ফুটো করে চলে যাবে বেশুমার চর্বির ভেতর
হে জাহাঙ্গির

তবু জেনে রাখ প্রত্যেক স্নানের পাশে কোথাও এক পাত্রসায়র থেকে যায়
জলে ডুবে গেলে সেই মনিহারি, পানের দোকান কত কশেরুকায়
নরম কত শ্যাপলার মতো
আর
এই ছাঁচি কালিপাতি এক গন্ডা দুই গন্ডা
গলতা, এক পন ঐ মিঠা

পাতা পড়ে গেলে সত্যি কোনও আওয়াজ হয় না
মাটি আর একটা প্যাকেট পেয়ে যায় শুধু

হাসান রোবায়েত- এর কবিতা

রাজহাঁস

১.
যে কোন জানালাই প্রকাণ্ড রোববার। পরিমিত জিভ
ফিরে যায় হাওয়ার উত্তর নিয়ে
দুটো রাজহাঁস কেবল পালকের নিচে
জমে রাখে হুইসিল। আমাদের সুস্থিত প্লেগ
পদ্মবনের ছায়া : লঘু চাল বৈ কিছু নয়

ধরো, সেই বিড়ালের কথাই
রোজ আঁচড়ে দেয় নরম টায়ারের চটি
দুধ খায়, পাশাপাশি হাঁটে
তখন সমস্ত পেতলের বাটি থমথমে লাল
মূলত সব স্নান বেড়ে ওঠে জলের দক্ষিণায়

২.
চিরকরবীর দেশ, যেখানে রাজহাঁস
ঠোঁট ভরে তুলে নেয় সাইরেন। এ দুপুর পলাতক
মিথ্যা কি প্রহরী তবে ? আগুনের বন থেকে ফিরে আসে
যে কূটকরতল তারই রেখা দেখি কিভাবে ভেসে যায়
মেওয়াফল সতর্ক ও সিলভার মন'নে

৩.
চটি- অর্থের পাশেই কমে যায় ধান খেত
অন্ধ ভীষণ ফুলগুলি তার
জেগে ওঠে মীনদৃশ্যে
একেকটা দুপুর রেখে গেছে ছুতোরেরা ময়না কাঁটার
পাশে

যে পিতা মুখ ভর্তি করে নিয়ে আসে ডলফিন মাছ
গভীর রাত্রীতে একটি জবা
নুয়ে পড়ে অন্য জবার দিকে
আমরা তাকিয়ে থাকি
নিম গাছের নিচে দুটো রাজহাঁস
কেমন ফুটছে বুদ্বুদ
বৃত্তাকার বিশ্রামে তার অজস্র গোলক

ইন্দ্রনীল ঘোষ- এর দুটি কবিতা

লিপি

আলো দোয়ানোর
ঘড়ি শুনছে পৃথিবী
ছেলেবেলা রিলে ছায়া মাঠ. . .

তুতলে যাচ্ছে যাবতীয় রেডিও
দু’ ফোঁটা আকাশ- মুখে, পাখির পানীয় প’ড়ে আছে. . .

সেই সম্ –

সেই কোন স্টেশনের থেকে
মানুষই তো লিপ দিচ্ছে মানুষের ঠোঁটে –
দানা দানা মায়েদের কোল আঁকা গুহাচিত্রগুলো
ভাষার সঙ্কেত ভেবে, ছায়া সারছে নদীতে. . .

দীর্ঘই

মীড় মাহিয়ার রেটিনা- কাটা ধান
তার অঘ্রাণ
এরোপ্লেন বানাতে বাধ্য করলো
যখন সব ক’টা কাগজে যাত্রী উড়ছে
তোমরা কবিতাকে চেনো
ওই যে প্রাচীন ফুসফুসের লম্বা ছায়া পড়েছিলো
তোমরা সেই দীর্ঘই- এর ভাঁজ করা বুদ্ধকে চেনো
তার আঁখির হোঁচট হচ্ছে পিলসুজ

জ্বালিয়ে দাও জ্বালিয়ে দাও
যা কিছু দেখলাম এ’ জীবনে

তানিয়া চক্রবর্তী- র সাতটি কবিতা

ভেতরে

সমস্ত গুহার মুখে কাঁটাতার
কলমিলতায় সাপের হিসসস
শোধনাগার দেখাব, ওখানে পাইপলাইন
দশমাস পরে পাইপ ভেঙে যায়
গুহার মুখে অনিয়তাকার আলেয়া
দরজা খোলা থাকে
ভেতরে জ্বলে ওঠে লেলিহান

আঁচড়

জং ধরা ব্লেডে মহাধমনীকে ছায়াপথ
আর মহাশিরাকে কৃষ্ণগহবর দিয়েছি
যারা গোপন সমাজে হাসে
ক্ষিতি, ব্যোম বলে ওরা পায়ুপাখনা দেখিয়েছে
বেহিসাবী রক্ত রেখায় মুদ্রা ওদের
এবার আর মানুষ হতে চাই না

উৎস

গায়ে ফুটেছে হাতের দাগ
এনামেলে এলোপাথারি নাবিক
সে গন্ধের উৎস খুঁজে বেড়ায়
তাকে পৃথিবীর বিশুদ্ধ বেদী দিতাম
সে যোনি খুঁজে বেরালো- - -

নিশানা

ও পাতা নিশানা তুই
জোড়া জিরাফের পাটিতে
খুব লাগে তোর, তবু মুখ বুজে- - -

“এরা” জুড়ে সহ্যের কেয়াপাতা
ও পাতা নিশানা তুই
ঠোঁট কামড়ে কালশিটে
স্নানঘরে লুকিয়ে দেখিস
শক্তিকে পুরুষ ভাবিস - - - মূর্খ মেয়ে

গুপ্তঘরে

বলেছ গুপ্তঘরে চরিতামৃত
বলেছ দীঘির কাছে পর্যাপ্ত
দরজা পেরিয়ে গেছি- - -
শেয়ালরা বলেছে তোমার খাদ্যে ভয়
অভাব অমানুষ করে দিলো
কল্পচিত্রে বিক্রি মেয়ের বিকৃতি
বালেন্দু আর রাকা জরিপ করছে ভাব
যারা চামড়াতে লাগিয়েছে সোমরস
তারাই সরাবে চন্দন

হা- ঘরে

দরজায় একটা হা- মুখ
দেয়ালে করোটি তার
সমস্ত প্রতিবর্ত শিলার খেলা
হা- ঘরের জন্য নিলামি হয় কালি
কালি দিয়ে হাপুস স্নান করি
পদাবলীর গায়ে ভেসে ওঠে
বোকা কলঙ্কের ছাট- - -

সন্দেহ –সিন্দুক

হানিকোম্বের কাছে বসে থাকে
দত্তক নেওয়া পোষ্য
কৃপাময় চোখে ছিদ্রের তাগিদ
উপড়ানো নখে মেয়েলি রক্ত
অক্ষরেখায় পুরুষদাগ

ওরা ফিসফিস করে সুতোর গল্প বলে
ওরা বন্ধুও হতে পারত
প্রেমিক হতে গিয়ে তস্কর বনে গেল
পোষ্যরা আর গন্ধ মেলায় না
২২/৭ সংখ্যায় আমি ওদের সন্দেহ সিন্দুক - - -

হাসনাত শোয়েব- এর কবিতা

অসুস্থ দুপুর

১.
যেখানে পাখিদের ঠোঁটে অস্থির মেঘ ভর করে থাকে।
কনক বলত, ঘুড়িদের ছায়া হারানোর দিনে সূর্যাস্তগামী মাছ একা একা পুড়ে যায়।
আমি কোমড়ে হাত দিয়ে ভাবতাম মানুষের বিকল্প নাম আর কি কি হতে পারে?
ভাবতে ভাবতে সূর্যের দিকে তাকাই। দ্বিপ্রহর এখনো মেলা দূরে। অথচ সকালটা কত দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে।
কনক নাই। নাই মানে যে চলে গেছে। আমি আর যেতে পারি না। অথবা বুঝে গেছি যাওয়া মানে কেবল
কোমড়ে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা।
হাতের মুঠোয় গলে যাচ্ছে মানুষের সমস্ত বিকল্প নাম।

২.
কে যাবে সেখানে? সোনামুখী রোদ যেখানে সুবর্ণরেখার দিকে বেঁকে গেছে।
ফুরিয়ে যাওয়া হাতের তালুর উপর ভর করে আছে অসুস্থ দুপুরকাল।
কনক বলত- ওই দূরের পাখিটা যে কেবল চিড়িয়াখানার দিকে উড়ে গেছে তার উষ্ণতা বিষয়ক কোন ধারণা ছিল না।
- ধারণা বলতে কেবল সোনাতাল মাছের ঘ্রাণ বুঝি। অথচ ঘ্রাণের তীব্রতা কখনো কান পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনা।
- ঘৃতকুমারী ফুলেরও ছিলোনা অস্তিত্ব বিষয়ক কোন জ্ঞান। সে শুধু জানত - ঘড়ির কাঁটা কেবলই নিজের দিকেই ঘুরে।
সমস্ত ভ্রমণ শেষে পড়ে থাকি আমরা নিতান্ত কোলাহল।

উমাপদ কর- এর তিনটি কবিতা

যুদ্ধযাত্রা

কাটা নখকেও খড়্গের মত দেখতে লাগে কখনও
শামুক যাওয়া কে যুদ্ধ যাওয়া
রাজার খেয়াল, মন্ত্রীর চাল, আর বোড়ের মাতলামি
শুক ও শারি র রেপ্লিকাও বলা যেতে পারে. . .

পয়ারে ঘুম পায় বাধ্য প্রভুভক্তির
যমকে ঢেকুর চালান রাতের নির্জনতায়
পাগল পাগলের সঙ্গে কথা বললে বিশাল মাঠেও
তিল ধারনের জায়গা মেলে না

বটি দা কুড়োলের আঘাতে আঘাতে সংসারও ছা- পোষা
তার প্লীহা বেড়ে যাওয়ার ভয় সবসময়
নিভু আঁচের উনুন থেকে সব মশলাপাতির কৌটো
চালান হয়ে যায় দেশ বিদেশের খামার বাড়িতে

ভুল নামতা পাঠের কংকাল আদিবাসী শিশুরা
উজান গাঙে সমান সাঁতার কাটে. . .

খাতা

জমানো হিসেব বাঁধা থাক রুমালের কোণায়
আমের আঁটি থেকে বেরিয়ে আসবে গ্রামের খোল
মাটিকে আদরে সোহাগে ভরিয়ে তোলার দিনগুলিতে
ডাহুক ডাক এনে দেবে যে নীরবতা
তাতে স্নান সারবে মোহন ডাঙার ক্ষয়ে যাওয়া না- পাওয়া

আগে আগে চলে যায় পথ আর পথের হিসেব
শুকনো পায়ের পাতা ভিজবে বলে আশ্বাস মিলেছিল
এখনও দু- ধারের অবিকল ছবিগুলো ভোগে লাগে পিয়াসির

অপেয়র হাত ধরে বসে থাকে বোকা বিকেলের নামতা
কিছুই কি নেই জানতে চেয়ে বিস্মিত সন্ধ্যার ভর্তি কলসী

আহা রে সুর মিশিয়ে ধরতে চায় যে রাতের মেরুদুটো
তার পূর্ণিমায় গ্রহনের আড়াআড়ি ভাবনায় জাগে দূর গ্রহ
কাকে বাড়াবে নীল নদীর হাত কার জন্য ফাঁকা রাখবে উঠোন
যাকে ধরবে সে তোমাতে কুলোবে না মনে হয়. . .

ক্যানভাস

কোথাও হারিয়ে যাবে বলে ফস্কা গেঁরো দিয়ে বসে আছে
সংসার তথা অসারের জটিলতা
পান্তার মত নয় নুন যতটা পরিপূরক লাগে স্বাদে
যতটা নরম হয়ে আসে সম্ভারের ঝাঁঝ
শুকনোয় পান্তা আর লাল কাঁচায় টিয়া
নুন ফুরোলে দেয়ালে জ্যোৎস্না এসে বসে, কিছুটা লবণ
কিছু ভেজা জামরুল আর রূপোলী পান- কৌটো থেকে
বের করে আনে পরের দিনের উষার সাজ
ততটা জটিল নয় তার মন্ত্রোচ্চারনের ঢং
নিবেদিত হতে ভালোবাসে, হয়ও, অধোবদনে
সন্ধ্যা প্রদীপের নিজস্ব একটা ভাষা আছে, সে বড় জটিল, কুহকময়
নিসর্গের পালটে যাওয়ার চাপ নিতে জানে
জানে নিজের কথা পাঁচ মুখ করে বলতে, কিছুটা বলাতেও
পান্তার মত চলন তার লংকার মত বলন
জটিল যাপন শুধু লবণের মিশ্রনে জল হয়ে যেতে পারে
আর জল মানে একেকটা বিচিত্র চিত্রাতীত সংসার. . .

পীযূষকান্তি বিশ্বাস- এর দুটি কবিতা

পরিযায়ী

একটা কথা, মুখের ভিতর,

এই জানুয়ারীতে গুনিতক হারে বাড়ছে শীত,
এই চিড়িয়াখানা থেকেও উড়ে যাবে এই সব শীত একদিন
কখনো আলোর থেকে এক এক ফোঁটা অন্ধকার
ছিনিয়ে নিয়ে একটা সুতোয় গেঁথে নেবে মালা
এক একটি বক্র রেখা
না আঁকা

অচেনা উত্তর গোলার্ধ
সুমেরীয় অক্ষরেখা বরাবর অচানক বরফ হয়ে
দিন রাত গুন ভাগ করে জেগে থাকে ভল্গার উপত্যকা

আর
রণক্ষেত্র থেকে অন্ধকার ছেড়ে যাবে আরো রক্তের দিকে
আর
মৃত হাঁসগুলির জীবনস্মৃতি পায়ে মুঠো করে
এক ঝাঁক বুনো হাঁস দিগন্তে পাখনা মেলে
পাড়ি দেবে সাইবেরিইয়ায় ।

গুমরাহ

কপালের উপর দিয়ে ফোর লেগ বাই
সীমানার বিপরীতে প্রবাহ
কসকে ধরে রেখেছি এখানেই গঙ্গা

গতিপথে হারিয়ে যেতে যেতে এক দলছুট মাছের ঝাঁকে
দুষ্মন্তের রাজ্য দ্রবীভূত হয়ে গেলো ত্রিবেনী সংগমে

বক্সারের প্রান্তরে ছড়িয়ে শূকরের চর্বি
ইলাহাবাদের পাড় ছাড়িয়ে সিপাহীর চামড়াও. . .

এক গঙ্গা রক্ত
গুলি বারুদের ভার বুকে নিয়ে
ভাগীরথীর শাখা- প্রশাখায়
কীভাবে

গুমরাহ হয়ে গেল ।

মানিক সাহা- র কবিতা

জলের চোখ

কাল নক্ষত্র গুণে গুণে জলের চোখের নিচে
সারারাত মেঘ জমে গেছে।
জেলখানার দেওয়ালের উপর আকাশের রং ছিল
স্মৃতির বুকের মত মৃদু - ম্লান - খসখসে লাল-
মানুষের বিছানায় সেইসব নক্ষত্রের ঘাস
নীলচে- সবুজ হয়ে শরীরের পাশে পড়ে আছে!

যারা পড়শির দিকে ঢিল ছুঁড়েছিল
যারা পাকাধান কেটে নিয়ে গেছে
তাদের উল্লাসে হিংস্র হয়ে বাতাসের তীর কুয়াশার বুক চিড়ে দেয়।

বোকা পুলিশের শিড়দাঁড়া ফিনফিনে
শিস হয়ে বেজে ওঠে, লক্ষ্মী- প্যাঁচার দল রানীর
আদেশ মেনে অন্ধ হয় - অন্ধত্বের অভিনয়
ফিরে ফিরে গানে ভেসে আসে।

চাঁদের মায়াবী গায়ে এখনো তো কিছু জল
কিছু ধানের তুষের মত মানুষের সুখ
লেগে আছে
কিছু মেঘ সোনালী জানালা খুলে উড়ে গেছে
আরো উঁচু দালানের দিকে -
তার আলো আজও এই মরা দেহ আলো করে আছে।

ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী- র কবিতা

পূর্ণচ্ছেদ

দেখ! কত কিছু ঘুরে টুরে,
সলতে পুড়িয়ে, পাশ ঘেঁষে
এখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম- মণিকর্ণিকা।
ছিন্নমূল, পত্রজাত, চাঁদ তারা গীত
- বিবিধ, সবই ভিত্তিক।
পূর্ণচ্ছেদ শুন্যতা, নিশ্চিত হয়ে সরে যাওয়ার,
ভেঙ্গে যাওয়া টুকরোতে স্বযত্নে জেগে থাকার মত - পরিবিষয়ী কবিতা।
বলে চলে যাওয়ার যা কিছু, শুকনো ধুলো ধারে সহায় করে যাওয়ার মত
কোনও এক মহাকাশে দেখা হবে, বা দক্ষিণ গোলার্ধে,
চিনব নিশ্চয়ই, হাত নাড়াব,
এক দুই কথা বলবে,
মস্তিস্কের ভাস্কর্যে জেগে থাকা- অনিমিখ সূর্য।

দীপঙ্কর দত্ত- র দুটি কবিতা

বর্ণনী

ক্রব্যাদাংশ পরিত্যাগ করে বহ্নিরক্ষণ, অবগুন্ঠন ও ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণের পর
ষট্‌কোণ, তদ্বাহ্যে বৃত্ত ও মণ্ডপে অবিদ্যা এখন বারোয়ারী
ক্লঃ অস্ত্রায় ফট্ বলে এভাবে তালি বাজাবেন যাতে 'ফট্' শব্দ নির্গত হয়
র‍্যানসম চাওয়ার আগে গ্রীল থেকে কেচাপ পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে
পীতায়ৈ শ্বেতায়ৈ অরুণায়ৈ কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ তীব্রায়ৈ স্ফুলিঙ্গিন্যৈ রুচিরায়ৈ
করালীর আংরা জিভ খাই
যোগিনীর ঠোঁট ব্রুকলীন চাবিয়ে বিপরীত রতির ছ্যাপ আর আঠার লেন বাই লেন যে স্ট্রিং ঝুলে পড়ে
তাদের ট্র্যাপিজ থেকে ড্রপ খেয়ে
ট্যাঁটায় ফালুদা যোনি টাকরায়
কষায় চাঁদ উঠে আসে
আর জ্যোৎস্নায় দাড়িয়াবান্দা কোর্ট থেকে প্রসারিত হাতগুলির এপ্রিল ব্লু ছুঁয়ে যায় ভৌতিক আঙ্গনবাড়ি
অ্যাতো নুমাইশ অ্যাতো নুমাইন্দগী ম্যাহফুজ স্তন ফুটে আছে অলিভল লালন করিনি
জন্মান্ধ প্যাঁচার কি রাত কি রোদ্দুর নাচনীশালিয়া পাড় খেয়ে শালিধান সানকি সানকি ঠিকরে আসে
ভাত -

কৃষি

কার্পেট বম্বিংয়ের পর জুতুয়াদের আটটা ছাপ্পান্নর কিথ কিন দোক্কার ফ্লাইট উড়াল ভরছে ফিদায়িন খলিয়ান
লাখ লাখ শমা চেড়া জিভের ব্রিসল্স ঘিরছে পরওয়ানা
হাতিশাল থেকে ভলকে ভলকে কালো ধোঁয়ার যে সাজো সাজো জগদ্দল তাদের বৃংহন গার্গলধ্বনি ঝেঁপে আসে

এক আকাশ

কুরুশের বাঞ্জি কুদ ও উছালের কুরোসাওয়া আঁকিরাবুকিরা
শয়তানের মওজুদা হুকুমত, উচ্ছুগ্য কইরা মারেন কাটেন কত্তা পাপ লাগবেনি
বিষঘুমের ভেতরে তেরাত্তির শুধু জেগে থাক মেয়ে
মাইল মাইল টেডিরা মাইন রুয়েছে বাজরাদূর্বার হিয়ায় হিয়ায় - -

---

Sally Silvers & Bruce Andrews @ The Poetry Project: "Song for Bernadette"

never never adumbrate

never fever

scumbling punchable larynx
snot god

sported inside mountain
yawn swerve

gliding dust to dust hard
shadow phase

hammy maverick nut there
scratching

crevice hording hot snow ocean bosses suds

scribble which ways blacking

“I also remember being struck by de Sade's will, in which he asked that his ashes be scattered to the four corners of the earth in the hope that humankind would forget both his writings and his name. I'd like to be able to make that demand; commemorative ceremonies are not only false but dangerous, as are all statues of famous men. Long live forgetfulness, I've always said — the only dignity I see is in oblivion.” — Luis Buñuel

ব্রহ্মবালিকা বিদ্যালয় অথবা এক আত্মীয় বিজ্ঞান

রমিত দে

.....আমরা সবাই অপ্রকাশিত

জলভরা এই নশ্বরতার ডানা.....

সত্যিই তো কবির নশ্বরতা সত্যিই কি নশ্বর ! কবির বাস্তবতা সত্যিই কি বাস্তব ! কবির প্রকাশিত সত্যিই কি প্রকাশিত ? ঠিক কোথায় থাকে কবির শব্দ? বাস্তবে ! নাকি তার তাপমাত্রা আরও কিছুটা গড়িয়ে পরম শূন্যে ঘোরে!- হ্যাঁ, এ প্রশ্ন শুধু একজন কবির নয়, একজন কবিই কেবল আদিম অগ্নিগোলকের মধ্যে স্বরূপের সৎ অবস্থান খুঁজে পেতে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে মরেন না, এ আকুতি একজন বিজ্ঞানীর- ও। যিনি আমৃত্যু তর্ক করে যাচ্ছেন বাস্তবতার ব্যাতিচার পেরিয়ে পেরিয়ে বাস্তবের ব্রহ্মতালুটির সংজ্ঞা নিয়ে। আর এখানেই একজন কবির বিস্ময়ের সাথে মিলিয়ে ফেলা যায় বিজ্ঞানের বীক্ষণকে। আর সেই কবি যদি হন জহর সেন মজুমদার, যিনি পাঠবিশ্বের বর্ণালী কুড়িয়ে কুড়িয়ে বৃষ্টিভরা সাইকেলে ঘুরে মরছেন কাথ কাথ সম্ভাবনার ইকোতে, তাহলে খুব সহজেই প্রতীকের মধ্যে আবিষ্কার হয়ে যায় সমান্তরাল এক প্রাণবিজ্ঞানের।

খুব ছোট্ট পরিসর, তাই বক্ত্যবের বয়স না বাড়িয়ে একজন কবি ও একজন বিজ্ঞানীর নির্বাচনের সুরটিকে বেঁধে ফেলা যাক। মানে ধরো, বরফ গলে গেল নুন গলে গেল অথচ পদার্থের মোট পরিমানে কোনো হেরফের হল না – এই হল বিজ্ঞানের সেই নির্বন্ধ যাকে আমাদের বিজ্ঞানীরা বললেন ভরের অপরিবর্তনীয়তা; সেই বিখ্যাত সমীকরন- $E=mc2$; অর্থাৎ ভর খরচ করে শক্তিতে পরিণত করলে সে বিলীন হয়ে যাবে অথচ যে শক্তি রইল সেই বিকিরিত শক্তি মোট ভরের সমান ভরবিশিষ্ট। অর্থাৎ যা ছিল তা এ মুহূর্তে নেই অথবা তা এ মুহূর্তেও আছে অথচ অন্য রূপে অপর প্রকাশে। আর এ তো কবিরই সেই অসীমতার সমীকরণ, ছবি থেকে প্রতিচ্ছবি শব্দ থেকে নৈঃশব্দ- জীবনসীমাকে অতিক্রম করে কবি চলেছেন স্বতন্ত্র সব জন্মের হাত ধরে। ভর ও শক্তির এই দ্বন্দাত্মক অন্বয়ই কবিতার উপাদান ও উপলব্ধির মধ্যে ধারাবাহিক আলো আঁধারি ফেলছে আর আমাদের কবি জহর সেন মজুমদার কবিতাকে করে তুলছেন থিওরি অফ টাইম ট্রাভেল। $E=mc2$ মেনে ক্ষুধা তৃষ্ণা আবিষ্ট মানবআত্মার আয়তনে লিখে ফেলছেন- ‘‘শক্তিতে রূপান্তরিত ঐ মাঠ, ঐ ঋতু, ঐ মেয়েলি জলধারা, ঐ বালির ওপর গড়ানো প্রেমিকের ক্রমাগত মাংযুদ্ধ, ঐ সুপারমডেল অতীত বিশ্বের আদিম স্তব্ধতা। একজন মৃত নারী যেন লবনের মত গলে গলে জল। সেই জলবোবার অন্তহীনতার থেকে উঠে আসে ঢেউ ও অজস্র জননফুল...। একি কোনো আঁধারগুচ্ছের আক্রমণ? একি কোনো স্টার ট্রেক সিরিয়াল? ওয়ার্প ড্রাইভ? স্পেসটাইমের

মধ্যে সুড়ঙ্গ তৈরী করে আমরা কতো দ্রুত মহাশূন্যের এক গাছ থেকে অন্য গাছে চলে যাচ্ছি, এক পাখি থেকে অন্য পাখিতে চলে যাচ্ছি... যেখানে মহাকাশ আর সমুদ্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। "- ভাষা ছন্দে বোধে শব্দে জাগ্রৎ থেকে সুষুপ্তি অবধি বিজ্ঞানের সেই অনন্ত অপরিবর্তনীয়তারই বিরাট প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন জহর ! যে আস্ত নদী টুকরো টুকরো হল তার কবিতায় তাই মিশে গেল মরা মানুষের খাটিয়ায়। যে ডোরা শার্ট পরা ব্যর্থ রাস্তা পৃথিবীর এক রিঙ থেকে অন্য রিঙে লাফ দিয়ে হঠাতই অদৃশ্য হল তারই দু বাহুর দৈর্ঘ্যের বর্গদুটির যোগফলের সমান করে অতিভুজ বরাবর জহর লিখে ফেললেন- "উড়ে গেলেও কোথায় যাব/ জড়ো করলাম খড় কুটো/ জন্ম নেবো- জন্ম নেবো/ থাকুক যতই মস্ত ফুটো".....আর এখান থেকেই তার কবিতা বারবার গ্রন্থীল হতে থাকে বিজ্ঞানের আবহে। যে 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' জহর খুলে দিলেন প্রাণীজগত উদ্ভিদজগত ভূমি ও ভূমার জন্য তা সময়ের অপেক্ষককে চিহ্নিত করে, কালের আক্রমণকে স্বীকৃত করে। বিজ্ঞানীর দর্শন যেখানে ভর ও শক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে খুঁজে নিয়েছেন প্রাকৃতিক জগতের এত বড় এক রহস্য সেখানে কবি এই যৌথনির্বাচনেই খুঁজে নিলেন প্রকৃতি ও পরিণামবাদের মাঝের সেই আচ্ছন্ন চেতনা, চৈতন্যের সেই গূঢ় সংহিতা। ভরের গায়ে গায়ে যেমন শক্তি থাকার গায়ে গায়ে যেমন না থাকা ঠিক তেমনি জহর সেন মজুমদারের কবিতায় শব্দের পিঠোপিঠি শব্দের বিকিরণ। বিজ্ঞানীর কাছে যা বিজ্ঞান তাই কবির কাছে হয়ে উঠছে বাক এই দু ক্ষেত্রেই রয়েছে ভৌত আর মানসিক ব্যাপ্তির ওতপ্রোত আপ্যায়ন। এ দু ক্ষেত্রেই বারবার বেসিক হয়ে উঠছে বাস্তব কি ? সে কি ধরাছোঁয়ার মধ্যে? সে কি থাকা আর না থাকার ব্যতিষঙ্গ?

বাস্তবের গাণিতিক অবস্থান মাপতে গেলে প্রথমেই চলে আসে- প্লেটোর গাণিতিক জগৎ কি বাস্তব!- এ প্রশ্ন তুলেছিলেন রজার পেনেরোজ; এবং দেখা যাচ্ছে তাঁর স্বপ্নরাষ্ট্র বা ইউটোপিয়ার মত গণিতকেও কেবল সরল গণিত, কেবল সমীকরণের শেষ মত মানতে চাননি প্লেটো; বরং তাঁর মতে বর্গক্ষেত্র- ত্রিভূজ- বৃত্ত- গোলকের ন্যায় গাণিতিক নির্বন্ধসমূহ প্রকৃত অর্থে কোনো বাস্তব ভৌতবস্তুসমূহকে নির্দেশ করেনা বরং তারা কতকগুলো আদর্শ সত্ত্বাকে নির্দেশ করে এবং এই আদর্শ সত্ত্বাগুলি ভৌত জগতের বাইরে অন্য এক জগতে বাস করে। আর এখানেই প্রশ্ন ওঠে তবে 'বাস্তব' কি? What is reality!- tables, chairs, trees, houses, plants, animals, people and so on- which are actual things made of matter?- নাকি তার সাথে সাথে জুড়ে দেওয়া সময় ও স্পেসের এক আন্তঃবিন্যাস ! প্লেটোর জগতে গাণিতিক আকারগুলির অস্তিত্ব স্থানিক অবস্থানে বা কালিক মাপে অস্তিত্ববান নয়, সেখানে বাস্তবের প্রথম ও শেষ রূপ বলে কিছু নেই বরং তার বোধগম্যতা আরও সূক্ষ্মতার স্তরে- না কোনো অতীন্দ্রিয়তার কথা প্লেটো বলছেন না বরং প্লেটোর মতে বস্তুমৌলের সংজ্ঞা যতটা না মানুষ কর্তৃক অনুমানিত তার থেকেও বেশি সত্য মহাজাগতিক আচ্ছাদনের প্রতিনিধি রূপে। অর্থাৎ জাগতিক গণিত যেখানে অনুমান থেকে সত্যে যাওয়ার কথা বলছে প্লেটো সেখানেই বিজ্ঞান বলতে সত্য থেকে অনুমানের উৎসবকে নির্দেশ করছেন। ফলে রিয়েলিটি কোনো আবিষ্কার নয় প্লেটোর কাছে, সে

ছিল সে আছে – গাণিতিক সম্ভবতায় সেই সত্যের ছায়া নিয়ে আমরা কেবল আমাদের Realm of Ideas বা আমাদের ধারণা রাজ্যে মুগ্ধ হয়ে চলেছি। অর্থাৎ যে নকশাগুলোকে আমরা গণিত বলছি, বিজ্ঞান বলছি, প্লেটো বললেন তা কালের অতীত, তার নকশা আগেই ছিল আর প্লেটোনীয় গভীরতর সেই গাণিতিক জগতকে ব্যাখা করতে পেনেরোজ নিয়ে এলেন তিনটি জগতের এক রাহস্যিক মিশেল। অস্তিত্ব বা রিয়েলিটির জগতকে কেবল প্লেটোর গাণিতিক জগতে সীমাবদ্ধ না রেখে তিনি প্লেটোনিক ম্যাথেমেটিকাল ওয়ার্ল্ডের সাথে জুড়ে দিলেন ভৌত আর মানসিক দুটি পৃথিবীকে।

আসলে বাস্তবকে আবিষ্কারের তাড়নায় জুড়ে দিলেন বাস্তবিক হেঁয়ালি, এবং সে হেঁয়ালি সময় ও কালের, যেখানে সার্বিক গাণিতিক ধারণায় ভৌত পরিস্থিতির সাথে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল মানসিক ব্যঞ্জনা; অর্থাৎ প্লেটোর আদর্শ অস্তিত্বকে পরম অস্তিত্বকে পেনেরোজ বিস্তৃত করতে চাইলেন সম্ভাবিত অস্তিত্ব দিয়ে। হ্যাঁ প্রতিটি বস্তু এমনকি প্রতিটি বিন্দুর চলাফেরা সেও তো আদতে সম্ভাবনার গাণিতিক নিয়মে বাঁধা; প্লেটোর অপরূপ গাণিতিক জগতের বাইরে এ সেই জন্ম থেকে মৃত্যুকাল আর মৃত্যুকাল থেকে মহাকাল অবধি চলা এক মিস্টিরিয়াস ভূমি যেখানে সম্ভাবতার আইন, যেখানে ভৌত আর মানসিক উদ্বেলনে বারংবার ধাক্কা খেতে খেতে বাস্তব বিজ্ঞানে পৌঁছয়, বিজ্ঞান সেখানে কেবল বাহ্য চিদাবস্থা নয় বরং বিরাট এক জাগ্রতস্থান –

আর কেবল একজন বিজ্ঞানীই নয়, এই সম্ভাবনার অসম্ভাব্য দরজা ঠেলে টাইম আর স্পেসের মধ্যে তো জেগে রয়েছেন আমাদের কবিও ! বিজ্ঞানীর মত তিনিও যেন এক অভিনিবেশী পর্যবেক্ষক যার কাছে বাস্তবতার বিকীর্ণতা পেরিয়েও বাস্তব কি তার বিস্ময়ের শেষ নেই। সত্যিই তো একজন কবির কাছে বাস্তবতা ঠিক কি? পৃথিবী নামক এই বায়োসকোপের কিছু নির্লিপ্ত স্থির কণা? নাকি গতিশীল তরংগ! ট্রাভেলিং ওয়েভ! আসলে বাস্তব নামক ডিসকোর্সটির মধ্যে ধরা রয়েছে বাস্তবতার ফাংশানটি যার মধ্যে একাধিক ডিসটরশন যুগপৎ দোলাচ্ছে 'বাস্তব' সংজ্ঞাটিকে। আমাদের কবিও হাত দিয়ে দুলিয়ে দুলিয়ে চলেছেন এই ক্রমপ্রসারণশীল টাইমমেশিনটিকে। একেই তো জহর সেন মজুমদার নাম দিলেন "বিপদ্দজনক ব্রহ্মবিদ্যালয়"। এই সেই আমি তুমি আমাদের মত আর্কষণজীবির আখ্যানপথ যেখানে কবি আমাদের নিয়ে ঘরছাড়া আমাদের নিয়ে বাস্তুহারা আমাদের নিয়েই খুঁজে চলেছেন আত্মা আর হৃদপিন্ড নিয়ে দাঁড়াবার জায়গা। কিন্তু এ তো ঘটনাতরঙ্গ! চৈতন্যের কমাঙ্ক জারিত! তাই কি ব্যষ্টি সম্পৃক্ত কবি মহাবিশ্বের বিরাট নৃত্যছন্দে দাঁড়িয়েও বলে উঠলেন- "জীব তো জীবভাবে থাকে না। আমরা শুধু কোয়ান্টাম অ্যাকশানের ক্রিয়াগুচ্ছ। আমরা শুধু আপতিত আলোকরশ্মি, এখানে গড়াই, ওখানে

গড়াই, এর পায়ে পড়ি, ওর গায়ে পড়ি, বুড়ো ঘানিগাছের নীচে বিবাহমন্ডপ বসাই- কিন্তু পা ফাঁক কোরে দাঁড়াই না কখনও। চন্দ্রসূর্যে কোঁৎ দেবার শব্দ ওঠে। এমন ভয়ংকর সে কোঁৎ যে ভয়াবহ রোদের দুপুরবেলা উপনিবেশযুগের ছোপলাগা পালকি থেমে যায়। নেমে আসে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। ১৮৪৮ সালের সেই কাঁকরে ঢাকা এপ্রিলের লাল পথ। দেবদারুবৃক্ষের ঋতু বন্ধ হয়ে গেছে। নদীমাতৃক অঙ্কনশিল্পের সামনে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ বেথুনসাহেব এখন কথা বলছে রামগোপাল ঘোষের সঙ্গে। একটা স্তব্ধতা, উড়ন্ত লালঝুঁটির স্তব্ধতা, তৎসহ নশ্বর আনারসবাগানের ঘুননিঝুম মিথোলজির মধ্যে কী কথা হচ্ছে বেথুনসাথেবের সঙ্গে রামগোলাপ ঘোষের পাঁজরপঞ্জিকায়? এই খুলে দিলাম পাঁজরপঞ্জিকা, এই খুলে দিচ্ছি পাঁজরপঞ্জিকা। শোনো তোমরা শোন কাৎ হয়ে থাকা পালকিতে হেলান দিয়ে বেথুনসাহেব। খন্ড খন্ড টিয়াটিলার ঠোঁট থেকে উড়ে আসছে নতুন ব্রহ্মান্ডের কিছু ফনাধরা হেঁয়ালি; একটার পর একটা কোঁৎ দেবার শব্দ হচ্ছে। জনহীন বাঙালির ভিটে দাঁড়িয়ে অস্পষ্ট স্বরে ক্রমাগৎ নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করছে আর কালস্রোতের মোটা রচনাবলীতে উত্তর জমা রাখছে...”- হ্যাঁ এ কেবল অস্তিতের স্থির রঙ্গ- তরঙ্গই নয়, পেনেরোজের মতই কবিও তাঁর মেঘ সূর্য গাছপালা ঈশ্বরীগাছ কিংবা ঘুরন্ত সাইকেলের বাস্তবোচিত শরীর গড়তে তুলে নিলেন ড্যুয়ালিটি অফ থট, অর্থাৎ বস্তু বা ভৌতের সাথে সেই অভিন্ন স্বরূপের একীকরণে লাগালেন আলোআঁধারির নকশা, এ নকশা চেতনার, থাকা এবং না থাকার মাঝের যে শূন্যতা তাকে ঘেঁটে তার ব্যাতিচার দেখার শূন্যতাস্পর্শী বিরামহীন লহমার। কবির চোখে এই কি সেই সর্বাঙ্গীণ জেগে থাকা ! বিজ্ঞানীর চোখে বাস্তব আর বাস্তবতার মত দুটি জায়মান দ্বান্ধিকতার মাঝের এই কি সেই সময় অপেক্ষক কাল অপেক্ষক সম্ভাবনার কোয়ান্টাম? যাকে ছুঁতে পারিনা কোনো যুক্তিপদ্ধতিতেই অথচ যে সত্য, যে ব্রহ্ম থেকে বিচ্ছিন্ন অথচ যে ব্রহ্ম !

জগতের একটা নিজস্ব বস্তুনিষ্ঠ অস্তিত্বের কল্পনা করাই যাই, কিন্তু কবিতার ? ব্যক্তিগত ভাবে আমার মনে হয় কবিতা কতকগুলো প্রবণতা থেকে আরও কতকগুলো প্রবণতা নিয়ে জন্মায় উপরের তিনটি পংক্তিই কবি জহর সেন মজুমদারের “বিপদ্দজনক ব্রহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের” একদিকে শব্দ বলছে বিষয়ে দাঁড়াও । অন্যদিকে শব্দ বলছে নির্বিষয়ে ফেরো। আর মাঝখানের “সমূহ সম্ভাবনা আমাদের লেখককে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে বিপজ্জনক ব্রহ্মবিদ্যালয়ের দিকে”- আর এই পারস্পরিক টানের ভেতর নিরপেক্ষ ভারসাম্য রাখতে তৈরী হচ্ছে বোধের সম্ভাবিত তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্রটি। এখন ভারপৃথিবী বা ভূতের সূক্ষ্মতত্ত্বে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে টাইম ও স্পেসের সন্দর্ভে বৃহত্তর অখন্ড সীমাচেতনার দুরকমের প্রবাহ দেখা যাচ্ছে জহরের চিহ্নিত ভাষায়, জহরের দ্বৈরাজ্যময় ভাবনায়। এক সিস্টেম ইন ইক্যুইলিব্রিয়াম এবং দ্বিতীয়টি সিস্টেম আন্ডার নেট ফোর্স। অর্থাৎ একদিকে যাপিত স্বকালের ভাষ্যকে ভাষায় অন্বিত করতে চেয়ে তিনি একধরনের কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি চাইছেন স্থির গতি চাইছেন আর এটা তখনই সম্ভব হচ্ছে যখন প্রাক- অতীত ও প্রশ্নাতীতের মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সামগ্রিক শূন্য ভার শূন্য টান নিয়ে। অর্থাৎ -

স্মৃতি ও স্বপ্নের যুগলে একজন কবির এই সেই চৈতন্যকে অর্জন চৈতন্যের সাথে নিজেকে যুক্ত করা যেখানে তিনি হালকা তিনি কুলকুন্ডলীনি থেকে বেরিয়ে আসছেন প্রাচীন কাছিমের মত, এখানে তার দোলন স্থির তিনি জানেন শূন্যের মধ্য দিয়েই তিনি মাটিতে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি জানেন দেহের দশপ্রকারের মধ্যে শুয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রহ্মান্ডের ঋতুবদল। অর্থাৎ দেহের ভেতরে থাকার, ভেতরের সেই আস্ত আর্তচিৎকার যা টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছে একটি স্থির সংগঠন তাকে তিনি চিহ্নিত করে ফেলেছেন। জেনে গেছেন এখানে আবহমান ও অনন্তের টান সমান। পিছন ফিরে দেখা ও সামনের কলধ্বনির মধ্যে একধরনের ক্রমজায়মান এককতা। অর্থাৎ

খন্ড থেকে অখন্ডে, আজকের জীবন থেকে কালকের জীবনে, সম্ভাব্য থেকে অসম্ভাব্যে একদিকে নিজেকে দু টুকরো করছেন জহর আবার তাদেরকেই যুগপৎ টান দিচ্ছেন; এই দুটুকরোর একপ্রান্তে ইদম অন্য প্রান্তে আত্মা আর দুজনে দুজনকে স্বীকার করে সৃষ্টি করছে একধরনের স্থির আবাস। এখানে কোনো বিক্ষিপ্তি নেই, পরমাণু থেকে পরমাত্মা - সমুদয় বস্তুই হয়ে উঠছে প্রকাশ্য বশ্য ও গ্রাহ্য। সমাশক্তি সম্পন্ন এক অতীত (ধরা যাক এই সেই ‘T’ বা টান যা জহরকে ঝুলিয়ে রেখেছে দুলিয়ে রেখেছে অস্তিত্বের অপরিমেয়তা দিয়ে মাটির দিকে মুখ করে) এবং এক বর্তমান (ধরা যাক এই সেই mg বা মাধ্যাকর্ষণীয় মালঞ্চ যেখানে বারবার বায়ুরূপ থেকে বস্তুরূপে বিধৃত হতে চাইছে কবি) এবং তাদের পারস্পরিক সম্প্রজ্ঞাত যোগফল এখানে জিরো, শূন্যের মধ্যেই কুড়িয়ে জুড়িয়ে রাখা পূর্ণের ইকোয়িং। এখানে এসে তিনি দ্বন্ধের অতীত, দ্বৈতের উর্ধ্বে। ধৃকেন্দ্রের মাঝে তাঁর নেটিভ ইন্টেলিজেন্স নিয়ে তিনি জেনে গেছেন সেই ধূ ধূ বীজক্ষেত্রটি যার চারপাশ সত্যি সত্যি ভাঙা আবার এই ভাঙা টুকরো গুলো জোড়া দিয়েই উঠে আসছে একটি স্থির সুঠাম শাশ্বত অনির্ভর থাকা। এখানে দাঁড়িয়ে জহরের কবিতায় মুহূর্তপুঞ্জ থেকে মানস অবধি একধরনের শৈল্পিক তীব্রতা যা দিয়ে অজ্ঞাতকে সংজ্ঞায়িত করে নিচ্ছেন তিনি, এখানে তিনি বহিরাগত বা বহিষ্কৃত নন, তাঁর প্রবেশপথ ভাঙা নয় বরং টেক্সটের পেরিফেরিতে প্রতিফলনের নকশায় জার্মিনেট হচ্ছে একধরনের টোটালিজম, একটা ভরাটস্থান। তিনি বলছেন- “আবহমান সময়প্রবাহে ক্রমে ক্রমে একক আমি, নিঃসঙ্গ আমি টের পেলাম আমার ভেতরে এসে জমা হচ্ছে অজস্র স্বরের নানা আমি। তারা কেউ বাপ্পার মত ছোট বালক, কেউ বড়দির মত, কেউ ব্রজগোপাল মৈত্রের মতো। এভাবেই আমার কাছে বদলে যেতে থাকল বাহ্য অর্থ, চারাগাছ, পুঁটিমাছ, পুতুল, কেঁচো, বড়দি, ভানু মৈত্র- এসবেরই এক অন্যরকম অর্থ; অন্যরকম অস্তিত্ব; .....রোদে এবং জলে ক্ষণকালের এই জীবন, অনেকটা আয়নাসদৃশ। যখন তার সামনে দাঁড়াই, তখন বুঝতে পারি আমিই বাপ্পা আমিই পুঁটিমাছ। আমিই ব্রজগোপাল কাকু আমিই বাদুড়। আমিই মহাকাশ আমিই কেঁচো। আমিই আলিস আমিই বৃদ্ধ ডাক্তার। আমিও একটা

ব্রহ্মাণ্ডচরিত্র; কখনও আস্ত আমি নই, ভাঙা আমি, ভাঙা ভাঙা আমি। এই ভাঙা আমিগুলোকেই জুড়তে বসাই কবিতা। একটা গাছ যেন ব্রহ্মাণ্ডচরিত্র, একটা পিঁপড়ে যেমন ব্রহ্মাণ্ডচরিত্র, আমিও তেমন ক্রমাগত গড়ানোর গতিবাদে কিছু আঁকড়ে ধরতে চাই। সেই আঁকড়ে ধরাই জীবন। এভাবেই ভেবেছি আমি। বুঝতে অসুবিধা হয় না গাছের দাঁড়িয়ে থাকা আছে বলেই আমার চলমান মুহূর্ত। চলমান কেন্দ্রবাসী সত্তা। হয়ত যা দেখছি সেই দেখাটাও সঠিক নয়। হয়তো আমিই ঘূর্ণনে দাঁড়িয়ে আছি, আসলে গাছটাই চলমান। ..... আসলে অজস্র ভাঙা আমিকে জুড়তে বসেছি আমি সূঁচ সুতো আঠা ছাড়াই। "- অর্থাৎ একটা ভারসাম্য বা ইক্যুইলিব্রিয়ামের মধ্যে কাব্যমুক্তির বীজ খুঁজছেন জহর। সর্বজনীনকে অতিক্রম না করে সর্বজনীনের সাথে মিলিয়ে নিচ্ছেন প্রাণের অহংতত্ত্ব । প্রকৃতি বা জগতকে ছাপিয়ে বা তাকে অস্বীকার করে নয় বরং প্রকৃতজকেই সেই অপরিহার্য সত্তা বা নেসেসারি অ্যাবসুলিউট মান্যতা দিয়ে তারই মধ্যে সত্তাকে সমাধিস্থ করা। অস্তিত্বের কিছু খুচরো শব্দ শুনতে শুনতে তীব্র তৃষ্ণা নিয়ে অসহয়তা নিয়ে বারবার মহাশূন্যের পাগলাগারদে ঘুরে মরছে জীবন –প্রলোভন- আসক্তি - বৃত্ত; শূন্যের দিকে ঘুমের ভাব আসছে, কবি বুঝতে পারছেন রিক্ত হওয়াতেই আনন্দ অথচ থাকার একধরনের আচ্ছন্নতা লীলার একধরনের পুষ্টি চেতনাকে দ্যুলোক থেকে স্বর্ল্যোকে পৌঁছোতে দিচ্ছেনা। এই পৌঁছতে পারাটাই জহর সেন মজুমদারের চিরন্তন ক্ষুধা, উন্মাদের মত যার জন্যে ফিরে ফিরে আসছেন অস্তিত্ব কোথায় জানতে, জানতে কোথায় সেই বেরোবার পথ ! অর্থাৎ লোকসত্তা ও লোকত্তরের পিপাসা এ দুয়ের মাঝে দানা বাঁধছে একধরনের অ্যাকসিলেরেশন যা কখনই শূন্য নয় যা কখনই স্থির নয়, অথচ শূন্যের কাছেই সে আত্মসর্মপণ চাইছে।

কবিতার শরীরে ম্যাটার আন্টিম্যাটার রিলেশনের মধ্যে দিয়ে একধরনের ম্যাগনেটিক মোমেন্ট আকার পেয়ে যাচ্ছে এক্ষেত্রে। "*Is the duality of life formed out of the non-duality of one universal process?*"- এই কি হয়ে উঠছে জহরের কাব্যতত্ত্ব ! এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আসা যাক জহর সেন মজুমদারে কবিতার গঠনতত্ত্বের কাছে। তাঁর কবিতার গ্র্যান্ড ডিজাইনে কোনো রকম ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরি পাওয়া যায়না, বরং অভিজ্ঞতার রূপ রিক্ততা থেকে যুক্তি ও অযুক্তি মিউটেট করতে করতে গড়ে উঠছে একধরনের সম্ভাবনা একধরনের প্রবাবিলিটি অ্যামপ্লিচুড। কালসিন্ধুতে দাঁড়িয়ে তিনি যে কাব্যবীজ খুঁজে চলেছেন সে কিন্তু থাকা না থাকা গ্রহন পরিবর্জনের মধ্য দিয়ে চিরকালীন থেকে ক্ষণকালের কিংবা ক্ষণকালের থেকে নিরাকৃত অলোকের ভাটিতে তার আবহমান উচ্চারণ খুঁজছে। আর এভাবেই তাঁর ব্যাখা ও বিশ্লেষণে লক্ষ্য করা যাচ্ছে স্টেবল অরবিট থেকে ছিটকে আসা কবিতাবীক্ষা। পাঠক কিছুটা বিমূঢ় হয়ে দেখছে চেতনারও একটা অ্যান্টিল্যাংগুয়েজ আছে আঙুল কেটে রক্ত বেরোনো আছে, চেতনাকেও কেউ যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ছড়িয়ে দিয়েছে চিরকালীন ভ্রমণবেদনার চারিদিকে। "*A system has not just one history, but many possible history*"- *Richard Dick Feynman* এর এই বক্তব্যের সাথে কোথাও যেন অদ্ভুত এক সযৌক্তিক সখ্য বা র‍্যাশানাল ফ্রেন্ডশিপ

দেখতে পাই জহর সেন মজুমদারের কবিতায়। কবিতার কোনো সারমর্ম চাননি জহর, ঠিক যেমন তাঁর স্বতন্ত্র্য ভাষার জঁ গুলোর মাঝে কোনো ইনডিপেন্ডেস এক্সিজটেন্স প্রার্থিত হয়ে ওঠেনি কখনও। সাহিত্যবোধকে কি অবলীলায় তিনি মিশিয়ে দিয়েছেন অন্তহীন গাণিতিক সমীক্ষণে। তাঁর "বিপদ্দজনক ব্রহ্মবালিকা বিদ্যালয়" থেকে কয়েক ছত্র নিয়ে আমরা এই বিক্ষিপ্তির আলোচনা করতে পারি। তার আগে দেখা দরকার বাস্তবতা কি! সেখানে কি শূন্যতারই অবিমিশ্র গিটার বাজছে? "দ্য গ্র্যান্ড ডিজাইন" এ স্টিফেন হকিংস ও লিওনার্ড মোডিনো তাদের "*What is reality"* এর মুখবন্ধে সোনালী গোল্ডফিস মাছের সাথে মানুষের বাস্তবতার একটি মনস্বী উদাহরণ পরিবেশন করেছেন; -"A few years ago the city council of Monza, Italy barred pet owners from keeping goldfish in curved goldfish bowls. The measure's sponsor explained the measure in part by saying that it is cruel to keep a fish in a bowl with curved sides because, gazing out, the fish would have a distorted view of reality. But how do we know we have the true, undistorted picture of reality? Might not we ourselves also be inside some big goldfish bowl and have our vision distorted by an enormous lens? The goldfish's picture of reality is different from ours, but can we be sure it is less real? নির্দিষ্টতার ফ্রেম থেকে কবিতার বাস্তবকে বের করে আনতে জহর সেন মজুমদারও যেন এমনই প্রশ্ন করছেন কবিতার কালিক সীমাচেতনায় থাকা মডেল ডিপেন্ডেন্ড রিয়েলিজমকে। শিল্পভাষার একাধিক বাইনারী বিভাজন দিয়ে চিহ্নিত করতে চাইছেন বস্তু ও বিবর্তনের মাঝের সেই "*Ensembles"* গুলোকে, যুক্তিসংগত বস্তুবিশ্বের ভেতরের দ্ব্যর্থদ্যোতকতার সাংকেতিক জগতগুলোকে। কবিতার ছত্রে ছত্রে ইমপসিবিলিটিস অফ প্রেডিকশন ছেড়ে যাচ্ছেন জহর। হয় তিনি আত্মা ও হৃদপিন্ড নিয়ে দাঁড়াবার কোনো যুক্তিবদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে চাইছেন না নয়ত পাঠককে দিচ্ছেননা চিরন্তন স্থানিকতার কোনো সমীকরণ। ঠিক যেমন কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জগতে কোনোকিছুই সুনির্দিষ্ট নয়, ঠিক তেমনি জহর সেন মজুমদারের কাব্যিক পরিসরে আমরা পাচ্ছি স্বকীয় আকস্মিকতা। বাকসত্তার বৃত্তকে ভাঙতে নতুন একটা রাস্তা খুঁজছেন বারবার, বারবার খারিজ করে দিচ্ছেন পংক্তির সুনির্দিষ্টতাকে; বস্তুর ভেতর থেকেই বেরিয়ে আসছে খাঁচাভাঙা বিস্ময় যা অ্যাকাডেমিক নিক্তি নিরিখের বাইরে পাঠককে নিয়ে চলেছে স্বরভেদী প্রস্বরের ডায়ালজিক জগতে।

কোয়ান্টাম লজিক দিয়ে জহর সেন মজুমদারের কাব্যদর্শনকে আমরা একধরনের ধ্রুপদী যুক্তিপরিসর দিতে পারি যেখানে কবির ব্যক্তিগত আর্কাইভস থেকে বোধ বারবার অভিক্ষেপ পালটাচ্ছে, স্পেস ও টাইমের পরিপেক্ষিতে গড়ে উঠছে চেতনার নেটওয়ার্কিং; কবিতা ছুটে চলে আইডিয়া অফ ট্রান্সসেন্ডেন্সের দিকে অর্থাৎ উদ্ভাসনের অসীম এলাকা গড়ে উঠছে, গড়ে উঠছে অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যক্তের একধরনের 'গ্র্যান্ড ডিজাইনিং'। কবিতা সেখানে কোনো কণা নয় বরং তরঙ্গ, সে যেন বারবার ধাক্কা খাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এবং ধারণা তৈরী

হচ্ছে। সাময়িক স্বল্পকালস্থায়ী থেকে সূক্ষ্মতার খোঁজে বেরিয়ে পড়ছে সে ধারণা। সেখানে অবিশ্বাস করতে চাইছেন চিত্তকে, চেতনার সংবেদনশীলতাকে বাড়িয়ে কবিতার অন্তঃসারে পৌঁছতে চাইছেন জহর, অনির্বচনীয় অনুভূতির আলাদা আলাদা বিচ্ছুরণ দেখতে চাইছেন। আলোর তরঙ্গ তথ্যের মত সময় ও পরিসরে দাঁড়িয়ে তাঁর কবিমানসের উদবর্তন যেন শব্দের ছোটো ছোটো অধিদৈবত রশ্মিদের ধরে আদিত্যে এসে মিলিয়ে যাচ্ছে। তাঁর কবিতার এলিমেন্টারি ক্যালকুলাসটিকে নাড়াচাড়া করলেই বোঝা যায় কবিতা রচনাকালে কোনো রকম হলনমি অ্যাপ্রোচ থেকে মুক্তি চাইছেন কবি, বরং সন্ধিক্ষণে রচিত সাদা কালো একধরনের উন্মাদনা, অতিরিক্ত এক দর্শন তৈরী হচ্ছে প্রাথমিক বাক্যদের ঘিরে। অর্থাৎ ব্যবহারিক প্রতীক থেকে সৃষ্টি হচ্ছে রাশি রাশি বিমূর্ত প্রতীক। অর্থকারক বা সিগনিফায়ার এবং কৃত অর্থ বা সিগনিফায়েড ক্রমশ নিরপেক্ষ হয়ে উঠছে; একধরনের শূন্যতার তাৎপর্য উঠে আসছে, উঠে আসছে আলো-ছায়ার অপার ভরাট। দক্ষ মনঃসমীক্ষকের ন্যায় কবিতার সাথে নতুন করে কথপোকথন করতে চেয়েছেন জহর। শব্দের ভেতর পড়ে থাকা টুকরো টুকরো অদ্ভুতত্বগুলোকে, ট্রমাগুলোকে অবচেতনের ভাষা দিয়ে নতুন এক সংকলন গড়ে তুলেছেন। তাঁর না বলার মধ্যেও রয়েছে একধরনের নতুন বলার বাসনা। অর্থাৎ কবিতাকে কখনই সরলরেখা দিতে চাননি জহর বরং দুটি বাক্যের মধ্যে, শব্দের দুটি চূড়া (*crest)* কিংবা দুটি ঢালের (*Trough*) মধ্যে সেই কন্সট্রাক্টিভ বা ডেসট্রাকটিভ ইনটারফেরেন্সকে বারবার প্ররোচিত করেছেন যা ইন্দ্রিয় থেকে ইনার কলিংকে, প্রাণ থেকে প্রজ্ঞাকে ক্রমাগত উন্মেষ দিয়ে চলেছে, জানার নগ্ন ভাষা থেকে উঠে আসছে অজানার অতিরিক্ত, উঠে আসছে শূন্যতার সাধনাঙ্গ। একে আমরা কি বলব? আত্মনুসন্ধান! সেলফ কনস্ট্রাকসন! নাকি রূপ ও প্রতিরূপে বসে মধ্যবর্তী নতুনের নাদানুসন্ধান! লাঁকা যাকে বলছেন “Neutralization of the signifier” অর্থাৎ কিনা চিহ্নায়কের ধীরে ধীরে বস্তু নিরপেক্ষে হতে হতে সমবায় থেকে শাশ্বত হয়ে ওঠা অর্থাৎ কবিই সেখানে চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের অর্থবহ আপতিক সম্পর্ককে মোটিভেট করছেন একধরনের ‘মগ্ন সংগঠন’ দিয়ে যা ভাষাকে চেতনাকে দ্যোতিত করছে তার অভিধেয় অর্থ থেকে। খুব বেশি কিছু না, সামান্য একটু বিজ্ঞানে ঢুকে পড়লেই এবং আলোর তথ্যের কাছে ফিরে এলেই আমরা স্টিমুলেট করতে পারব নিছক একটি স্থূল কবিতায় ক্রম তরঙ্গায়িত জহর সেনমজুমদারের সূক্ষ্ম স্বরূপের স্টিমুলিগুলোকে। নিউটন জানাতে পেরেছিলেন আলো কেন সরলরেখায় চলে, তার করপাসেল থিওরি (Corpuscle theory) দিয়ে জানাতে পেরেছিলেন কেন এক মাধ্যম থেকে অপর মাধ্যমে সে বেঁকে যায় প্রতিবিম্বিত হয় কিন্তু তার উপপাদ্য দিয়ে “নিউটন রিং” কে ব্যাখা করা যায়নি। এখন কি এই ‘নিউটন রিং’ বা জহর সেন মজুমদারের কবিতায় তার প্যার্টান বা প্রসঙ্গটা কতটা বাস্তবোচিত সে সম্পর্কে আসার আগে দেখা যাক কিভাবে কবিতার সনাতনী পুঁথিটিকে জহর ভেঙে ফেলছেন কয়েকটা সূক্ষ্ম তরঙ্গে যারা একে অপরকে কখনও ধ্বংস করছে আবার একে অপরের সাথে একাকার হয়ে গড়ে তুলছে নতুন কবিতার ভাষা। তরঙ্গ তত্ত্বানুযায়ী একটা লেন্স বা গোলতল বিশিষ্ট স্ফটিকখন্ডকে আমরা যদি একটা চ্যাপ্টা প্রতিফলক সমতলে রাখি এবং ওপর থেকে একজাতীয় একই তরঙ্গবিশিষ্ট আলো প্রতিস্থাপিত করা যায় তবে দেখা

যাবে ওই সমতলের কোণ ধরে ধরে গড়ে উঠছে আলো ও ছায়ার একজাতীয় অসীম সম্ভাবনা, সিরিজ অফ লাইট অ্যান্ড ডার্ক রিংগস। তরঙ্গ তথ্য কিন্তু এর সুন্দর একটা ব্যাখা দেয়। আলোর সাথে সাথে উদ্ভাস ছায়ামূর্তির কারণ আসলে একধরনের ধাক্কা; ধনাত্বক বা ঋনাত্বক ধাক্কা। এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে সঞ্চরণশীল আলোর একটি তরঙ্গের একাধিক চূড়া যখন সমান তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট অন্য তরঙ্গের একাধিক ঢালের সাথে ধাক্কা খাচ্ছে কোলাইড করছে তখনই তৈরী হচ্ছে একরকমের স্থিতাবস্থার যাকে বিজ্ঞান বলছে ডেস্ট্রাকটিভ ইনটারফেরেন্স আবার যখন একটি চূড়া অপর চূড়ার সাথে ধাক্কা খাচ্ছে, একটি ঢাল তার অপর অনুরূপ ঢালের সাথে ধাক্কা খাচ্ছে তখন ওয়েভ পার্টিকেলে সীমার উত্তরণ দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ সে আরো বড় তরঙ্গে পরিণত হচ্ছে যাকে বলা হচ্ছে কনস্ট্রাকটিভ ইনটারফেরেন্স বা গঠনমূলক তরঙ্গযোগ। জহর সেন মজুমদারের কবিতাও তো আসলে জলের মত মত আলোর মত তরঙ্গের গণিত সম্বল করে মহাচেতনাকে ভেতরের ঢেউগুলোকে ভাঙতে চাইছে বারবার। বাক্যের মধ্যবর্তী লজিক্যাল ফাঁকগুলো ভরাট হতে হতে ক্রমশ দ্বিমাত্রিক থেকে ত্রিমাত্রিক কিংবা ত্রিমাত্রিক থেকে বহুমাত্রিক হয়ে উঠছে কবিতা। দুটো কবিতাকে পাশাপাশি রেখে আমরা জহরের কবিতার ধ্বনিতরঙ্গগুলোকে পর্যবেক্ষণ করতে পারি, দেখতে পারি কিভাবে সীমাকে পেরিয়ে যেতে যেতে নিটোলকে ছিন্ন করতে করতে দাঁড়াবার জায়গা খুঁজছে তাঁর কবিতারা। ‘‘কহি আমি জননীরে’’ কবিতায় জহর লিখলেন –

“কহি আমি জননীরে, স্বাতীরূপা শোনো শোনো, আমদের এই অতৃপ্ত স্বপ্নতাঁতের ওপর

কখনো কোনো প্রজাপতি মৃদু মৃদু অতিমৃদু ডানা মেলে নাই, তবুও আমরা এই

মহাপৃথিবীতে নদী করলাম, কৃষি করলাম, ধৃ করিলাম, লবণ করিলাম, এমনকি

পঙ্গু ভিখারির পদপ্রান্তে অন্ধকারও করিলাম, প্রত্যহ একবার হলুদ শিকড় চুষে

গাছের কান টানলাম মাথা এলো, মৃদুমন্দ কাঠবিড়ালিরাও আমাদের জন্য স্বর্ণযুগ বয়ে নিয়ে এলো

কিন্তু খুশি নই আমরা একটুও খুশি নই, কোথা গেল প্রজাপতি? কোথা গেল?

.....

.....

যুগ যুগ ধরিয়া আমরা মৃত, কোথাও যাই নাই,

যুগ যুগ ধরিয়া আমরা আমাদের এই অতৃপ্ত স্বপ্নতাঁতের উপর রক্তকরবীর বঙ্গভাষা

তৈয়ার করিয়াছি, কেহ আসে নাই, কহি আমি জননীরে, কহি আমি জননীরে

পারো যদি একবার দেহ পালটে দাও, এই দেহ বড় বেশি পুরোনো হইয়াছে, এই দেহ

বড় বেশি নোংরা মাখিয়াছে, শূন্য শূন্য দেহশূন্য করো, শূন্য শূন্য দেহশূন্য করো" ...

এই কবিতার মাঝে একধরনের ডেস্ট্রাকটিভ ইনটারফেরেন্স অনায়াসেই চিহ্নিত করা যেতে পারে। এখন প্রশ্ন কীভাবে! কবিতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় লাইনে একধরনের ধনাত্বক অসীমতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, লক্ষ্য করা যাচ্ছে একধরনের আশাবাদ। প্রচুর প্রচুর বাস্তবের মাঝে জহর যেন রেফার করছেন একটি সদাপ্রসন্ন সহাবস্থান। অনুরাগের ঢেউগুলো দৃশ্য ও বস্তুকে একাকার করতে করতে অভিজ্ঞতার জগতে অন্বেষণ করছে একধরনের বন্ধুতা, বেঁচে থাকার অমোঘ ছন্দ। অথচ নবম ও দশম পংক্তিতে আমরা লক্ষ্য করতে পারছি শিকড়চ্যুতির কান্না। সময়ের সন্দর্ভে সেখানে সদাই ঠোকর মারছে একধরনের চিৎকার একধরনের মৃদু কাতরানি। মহাজগতের সর্বাঙ্গে কবি আসলে এক সঙ্গহীনতার ক্রিয়াতরঙ্গ তাই তার ঢেউ দিয়ে ছুঁতে চাইছে প্রাণের জায়মানতাকে, ফেরাতে চাইছে অর্থহীন খুব নরম ঠান্ডা হেরে যাওয়ার দিকে, সমপর্ণের দিকে। পার্টিকল থিওরি অফ লাইট অনুযায়ী কবিতার এই দুটো অংশকে আমরা যদি একটা লেন্স ও একটা রিফ্লেক্টিং প্লেট হিসেবে ধরি তাহলে খুব সহজেই দেখব দুটি মাধ্যম থেকে বাক্য ক্রমশ অর্থময়তা থেকে মুক্তি পেতে একধরনের সমান্তরাল টেক্সট তৈরী করছে, সেখানে কবির ব্যক্তিক দৃশ্যের উত্তরণে ক্রমাগত স্পষ্ট হয়ে উঠছে স্মৃতি ও সময়ের ব্যপ্ত চরাচর। অভিধেয় অর্থ থেকে দ্যোতনা অর্থে পৌঁছে যাচ্ছে কবির আত্মপ্রশ্নগুলো। এই দুই মাধ্যমের তরঙ্গ ও বার্তাগুলো কিন্তু সচেতনভাবেই কবি বানিয়েছেন আলাদা আলাদা তরঙ্গদৈর্ঘ্য আলাদা আলাদা ওয়েভলেন্থ দিয়ে অথচ ক্রমাগত দুই বিপরীত ঢেউয়ের উত্তুঙ্গ শিখর ও অবতলগুলির পারস্পরিক সংঘর্ষে চিন্তাশীল জীবন্ত ঢেউগুলো ক্রমশ চলমানতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকা মেরুতন্ত্রের বোধটিকে চিনে ফেলে; আর এখানেই কবি বাকের ইনসুলেশন বা ঘের থেকে নির্বাকের সোম্য স্রোতে প্রবেশ করছেন। ঢেউ এখানে থেমে যাচ্ছে । সানু থেকে সানুতে আরোহিত তার ফ্রন্টাল কনসাসনেস ক্রমশ গুটিয়ে ঢুকে পড়ছে চেতনার উৎসে। আর জহরের কবিতা ক্রমশ প্রয়াসহীন শর্তহীন বাকহীন প্রজ্ঞানের কাছাকাছি হয়ে উঠছে। আবহমানকালের অভীপ্সায় দাঁড়িয়ে জহর সেন মজুমদার যখন বলে উঠছেন – "শূন্য শূন্য দেহশূন্য করো, শূন্য শূন্য দেহশূন্য করো" তখন শূন্য তো স্থাপিত হচ্ছে কোনো হিরন্ময় পূণ্য দিয়ে! আসলে বস্তু ও বিবর্তনের রেশ ধরে ধরে অনুসন্ধিৎসার পরম তুঙ্গতার নীড়টিকে খুঁজছেন জহর। সরলরৈখিকতা থেকে বেরিয়ে এসে কবিতার মুক্তমেলাটিতে বিশ্লেষণ করতে চাইছেন মহাকালের মোমেন্টাম। " *Rhetoric of the image"* এ রঁলা বার্থে বলেন- " There is a plurality and a co-existence of lexicons in one and the same person, the number and identity of these lexicons forming in some sort a person's idiolect. The image, in its connotation, is thus constituted by an architecture of signs drawn from a variable depth of lexicons (of idiolects); each lexicon no matter how "deep," still being coded, if, as is thought today,

the psyche itself is articulated like a language; ……The variability of readings, therefore, is no threat to the "language" of the image if it be admitted that ,that language is composed of idiolects, lexicons and sub-codes. The image is penetrated through and through by the system of meaning, in exactly the same way as man is articulated to the very depths of his being in distinct languages. The language of the image is not merely the totality of utterances emitted, it is also the totality of utterances received; The language must include the "surprises" of meaning.। অর্থাৎ কোনো একটা দিক দিয়ে দেখলে বাস্তব উচ্চারণের ভেতর দিয়ে এই বিকল্প চিত্রকল্প অবধি পৌঁছতে গেলে বক্তা ও শ্রোতাকে সংযুক্ত করছে একাধিক ধ্বনি তরঙ্গ, তরঙ্গের যোগ বিয়োগেই গড়ে উঠছে জহরের কবিতার ভেতরের ওলটপালটগুলো।

“surprise of meaning” অবধি পৌঁছতে ধ্বংসাত্মক ইনটারফেরেন্সের পাশাপাশি জহর সেন মজুমদারের কাব্যায়নে আমরা সৃজ্যমানতার কিছু কনস্ট্রাকটিভ ইনটারফেরেন্স বা গঠনমূলক তরঙ্গ সংযোজনও লক্ষ্য করতে পারি। সেখানে শব্দ থেকে অন্য আর একটি শব্দে, বাক্য থেকে অন্য আর একটি বাক্যে একধরনের ইউনিনিমাস কম্পোজিশন যা সমান আকারের কাব্যজিনগুলোকে যুক্ত করে আরও বড় করে তুলছে, অর্থযুক্ত ভাষার সজ্জা সংরক্ষণ থেকে বেরিয়ে অন্তর্লীন একাকার হয়ে উঠছে। আয়তনে বেড়ে উঠছে বোধের নিহিত বার্তাটি, গঠনমূলক ইনটারফেরেন্স কিভাবে একটি কবিতাকে সময় থেকে সময়হীনতার দিকে নিয়ে চলেছে তার উদাহরণ পেতে আরও কয়েক পংক্তির কাছে আসা যাক-

‘‘ ফ্রিজের ভেতরকার খাবারের মতো নিরীহ এই ঘুম

গ্রীবা, এলোকেশ, মাংসের নিহিত সীসা,

পারমাণবিক ফ্রিকোয়েন্সির গভীর এক আবেদন।

ক্ষয়। দেখতে পাই, চারপাশে ফ্রিজভর্তি ঘুম।

আর সেই একবিন্দু বহুবিন্দু ঘুমও,

নৌকোচালকের ঘুম,

লরীচালকের ঘুম,

রিক্সাচালকের ঘুম,

কুয়াশাচালকের ঘুম, আরো উন্মোচন, আরো চরিত্রলিপি,

দুরূহ সান্ধ্যভাষার মতো, নিয়মহীন অন্ধকারের মতো

আসে উড়ে, মেরুদণ্ডে বসে থাকে পাখির মতো।

ঘুমের ঘোরে পিঠ উলটে সুপথ কুপথ ভাঙচুর।

রূপোর নোলক দেখে মনে হয় এই পাখি

অনেক গাছ আর অনেক বাচ্চার শ্বাসনালী টিপে

এখানে এসেছে ।

তার উড়ে আসা শাড়ির পাড় থেকে খসে পড়ছে

রাস্তা খসে পড়ছে বাসস্ট্যান্ড

অনেক অনেক রাত্তিরে শুধু সেই ফ্রিজের দিকে গড়াতে গড়াতে

এগিয়ে যায় হেডমাস্টারের খাতা, অঙ্কমাস্টারের দুটো চোখ.....”

ওপরের কবিতায় “ঘুম” শব্দটাকে নিয়ে কিছুটা বেজে ওঠা যাক। দেখা যাবে সময়মুক্তির দিকে কিভাবে বয়ে চলেছে একটি সংযোজন তার সমান তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট দ্বিতীয় তৃতীয় বা বহুবিধ তরঙ্গের হাত ধরে ধরে। ক্রমাগত বড় হয়ে চলেছে একটি উচ্চারণ এবং তার ভেতরের অঘোষণাটি অনুচ্চারণটি স্বকালের ভাষ্য হয়ে উঠতে চাইছে। একাধিক “ঘুম” শব্দকে গঠনমূলক ইনটারফেরন্সের মাধ্যমে জহর সেন মজুমদার যে বৃহত্তর তরঙ্গটির সৃষ্টি করলেন তা কিন্তু শেষমেশ জেগে থাকার স্বয়ংসম্পূর্ণ ভল্যুমের কাছে আমাদের নিয়ে আসছে। “অঙ্কমাস্টারের দুটো চোখ” ক্রমে অস্পষ্ট হতে হতে হারিয়ে যাচ্ছে দরিদ্র ঘুমের আর্তিতে। অর্থাৎ সাধারণ ভাষা সম্পৃক্ত হতে হতে ক্রমশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠছে। এখানে প্রতিটা ঘুমের তরঙ্গদৈর্ঘ্য এক অথচ তাদের অ্যামপ্লিচিউড বা উচ্চতা এবং ফেজ বা সরে যাওয়ার পরিমাণ আলাদা আলাদা। ঘুম এখানে একটাই শব্দ যা বিচিত্র অর্থের আলোছায়া তৈরী করছে অথচ এর ভেতর দিয়ে একটাইমাত্র পথ তৈরী হয়েছে, একটাই মাত্র আয়োজন, গাঢ় ঘুমের নকশার মাঝে জহর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছেন না আসা ঘুমের কথা, ঘুম আর জাগরণের মাঝে সেখানে জীবন যেন বলাবলি করছে কোনো শীতল সান্ধ্যভাষা। বৃহদারণ্যকে হিতানাড়ীর উল্লেখ আছে যা হৃদয় থেকে মাথা অবধি ক্রমপ্রসারিত এবং যার কাজ মূর্ধার ভেতর দিয়ে সূর্যমন্ডল অবধি পৌঁছোনো অর্থাৎ

আলোর একটা একক নির্যাসকে চিহ্নিত করা। গঠনমূলক ইন্টারফেরেন্স বা ধ্বংসাত্মক ইন্টারফেরেন্সের মধ্য দিয়ে জহর সেন মজুমদারের কবিতারাও এমন কিছু প্রবহমানতাকেই কবিতার ভাষায় প্রতিস্থাপিত করতে চাইছে। আর আমরা যে তরঙ্গের যোগ বিয়োগ নিয়ে কথা বলছি তা আসলে জহরের চেতনার অনুরণনগুলো অনেকার্থগুলোই।

পাশাপাশি অ্যানালাইটিকাল জিওমেট্রি অ্যাসিম্পটোটিক কার্ভের কথা বলছে যেখানে কোনো কার্টেশিয়ান সমতলে আঁকা নেগেটিভলি স্লোপড রেকট্যানগুলার হাইপারবলা ক্রমাগত দুই মেরুর দিকে অগ্রসর হয়ে শূন্য হতে চাইলেও সম্পূর্ণ শূন্য সে কখনই হতে পারে না, অর্থাৎ শূন্য অবধি পৌঁছবার এক আকুতি তাকে কোয়ান্টিটেটিভ মালটিপিলিসিটি দিলেও একটি অখন্ড শূন্য কখনওই এই আকুতি ছাপিয়ে উঠছে পারছেনা; জহর সেন মজুমদারের কবিতায় অনুপ্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে অখন্ডের প্রতি এমনই এক অভি্যান, বাস্তবের গঠনসূত্র পাওয়ার এক বৌদ্ধিক মায়াবাদ। তিনি একেবারে হু হু শূন্য হতে পারছেন না, তাকে হু হু শূন্য হতে দিচ্ছেনা পঞ্চভূতের জলবায়ু ; একই কবির মধ্যে একদিকে আস্তিক্য প্রনীত এক সংসারী অন্যদিকে আরশিনগরের এক বাউল- সবটাইতো বাস্তব –কবির বাস্তব কবিতার বাস্তব যাপনের বাস্তব, এই একই বাস্তবে একই সাথে গুহার গাঢ় প্ররোচনা আবার ধু ধু আকাশের টানা ঘুম । মাঝে রেকট্যানগুলার হাইপারবলার মত মহাকালের গৈরিক জানলা খোলা, যা হাওয়ায় দুলছে, দ্রষ্টার দর্শনের হাওয়ায়, পুঞ্জীভূত চেতনার হাওয়ায় আর বারবার বৃত্ত থেকে বোধস্বরূপে যেতে গিয়ে তাঁর স্বরূপেই আটকে পড়ছেন কবি, উন্মাদ হতে চাইছেন, শূন্য হতে চাইছেন অথচ এক ধরনের দ্বৈতবাদ তাঁর হাত টেনে ধরছে।

কবিতার মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে অতিদূর ব্রহ্মান্ডের মোচড়; বিষয়ভাবনার মধ্যে এইভাবে অতিসূক্ষ্ম ফাঁক রেখে দিয়েছেন জহর যা শেষ পংক্তি পর্যন্ত সত্যকে চিরে চিরে বিচার করতে চাইছে, নিঁখুত মেপে যাচাই করতে চাইছে আর যাপনের অ্যাসিম্পটোটিক কার্ভে দাঁড়িয়ে কবিতা শূন্যের শীর্ণময় খোঁড়াখুঁড়ি হয়ে উঠছে; যেমন তাঁর শ্রীজীব কবিতার শেষ কয়েক পংক্তি আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি। আলোচ্য পংক্তিগুলিকে একটি অ্যাসিম্পটোটিক কার্ভের মধ্যে প্রতিস্থাপিত করে দেখা যাক কিভাবে শূন্যের আকুতি, ব্যঞ্জনা অনেক দূর পৌঁছে গেলেও শূন্য কিছুতেই শূন্যে মিলতে পারছেনা। দেখা যাক কিভাবে বেড়ে চলেছে কবির রক্তদাগ আর বিরোধাভাসের জায়গাগুলো-

‘‘একদিন শ্যামল কিশোর আমরা, চেয়ে দেখি, পৃথিবীর নগ্ন ধানক্ষেতে

চাষাদের জলভর্তি মাথা ফেটে গলগল করে বেরিয়ে আসছে পরিশ্রুত জল

এই জল মৃত প্রেমিকার জরায়ুর ভেতর প্রবেশ করে পুনরায়

দরিদ্র প্রেমিকের প্রদীপ শিখাটি জ্বালিয়ে দেয়, জল, জল, জল

পৃথিবীর কঙ্কালেরা এই জল পেয়েই বার বার ছৌ নাচ শিক্ষা করে

নবদ্বীপের জিহ্বায় শঙ্খ হাতে এসে দাঁড়ান শ্রীজীব গোস্বামী

ছড়ানো ছিটানো উর্বর শিউলিফুলগুলো আবার পুরুষ ভাস্কর্যের পাশে

নীচু হয়ে ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে একবার দুইবার জিরাফকে ডাকে

স্মৃতিভ্রষ্ট জিরাফ, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? তুমি কি বুঝতে পারছ?

নৈরাত্ম্যমণির কালচক্ষু আমরাও এই নীল বিষে ধরে রাখতে চাই

আমরাও তোমার মতো জলকেলি করতে করতে একবার উন্মাদ হতে চাই – ‘‘

আসলে ঘুরে ফিরে এই সেও ভর আর শক্তির রূপান্তরের সমতুল্য। যে জল চাষাদের জলভর্তি মাথা ফেটে বেরিয়ে পড়ে সেই জলই ঢুকে পড়ে মৃত প্রেমিকার জরায়ুর ভেতর। যা শূন্য হচ্ছে তা নির্ভুল ভাবেই জমা হচ্ছে অন্য কোনো পূর্ণে। বিকিরিত তরঙ্গের মধ্যে দিয়ে আইনস্টাইন থেকে বোর কিংবা হাইজেনবার্গ বস্তু ও বাস্তবের মাঝে সমগ্রতার যে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দিয়েছেন পার্থিব বিশ্বে, যেখানে দাঁড়িয়ে কোয়ান্টাম মেকানিক্স বারবার প্রকৃতিকে বাস্তবকে নিঁখুত ও সুনিশ্চিতভাবে পুরোপুরি ব্যাখ্যা কখনই সম্ভব নয় বলে মেনে নিয়েছে, মেনে নিয়েছে বাস্তবতা আসলে বাস্তবের সংজ্ঞাকে খুঁজে পাওয়ার এক প্রচেষ্টামাত্র, এক খন্ডরূপ, সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের কবিও মেনে নিয়েছেন কবিতা সে কেবল সম্ভাবনার ছড়াছড়ি। তার একটা কণা কোথাও কোন মুহূর্তেই স্থির বিন্দুতে নেই, রয়েছে শুধু ওই বিন্দুতে থাকবার সম্ভাবনা। আর থাকার এই ধারনাগত দর্শনটি কেবল চেতনানির্ভর। কেউ জানে না তার কি ব্যাখ্যা। জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল, আর মৃত্যুকাল থেকে মহাকাল পর্যন্ত তারা সমানভাবে জায়মান, ঠিক যেভাবে জায়মান কবির ‘ব্রহ্ম বিদ্যালয়’, সেখানে টাইম ও স্পেসের আবহসঙ্গীত ধরা, সেখানে আমরা জানিনা রাস্তা কোথায়, কীভাবে ঢুকবো, বেরোবো কীভাবে – নাভি থেকে মাথার দিকে, শিরা থেকে স্বপ্নের দিকে- কেবল ঘুরে বেড়ানো জাতিস্মর হয়ে ...এক জন্ম থেকে আরেক জন্মে...

(সংক্ষেপিত- প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ প্রকাশিতব্য ক্যানেস্তারা বইমেলা সংখ্যা)

প্রবন্ধ

কবিতার রস
উমাপদ কর

মায়ের কাছে মাসির গপ্পো বলার অভ্যেসটা দীর্ঘ দিনের। কেউ কেউ তার লোভ সামলাতে পারে না। আমিও মাঝেমধ্যে ওই লোভে মাছি হয়ে যাই। তখন কে কাকে পায়। উড়তে থাকি শুধুই। রস কোথায়, কোন মুলুকে, সাকিন কী? তো রসে বসার ঝামেলাও বিস্তর। বসলে উঠতে ইচ্ছে করে না। শুধু মনে হয় টেনেই যাই, রসাস্বাদন যাকে বলে আর কি? অনেক সময় বিস্তর ভালো লাগালাগিতে পেয়ে যায়। তখন উঠব কি? ডুবে মরব কিনা তাই মনে থাকে না। পরে একসময় ইচ্ছে না থাকলেও ভিন্ন রসের সন্ধানে ছুটতে হয়। নয়ত একটু একঘেয়ে মনে হয়। আবার কখনও এমনটাও হয় যে ডানায় রস এমন সাপ্টে ধরে যে উড়তে যাওয়া বৃথা হয়ে যায়। প্রাণসংশয় হয়ে দাঁড়ায়। তখন শুকোতে দিতে হয়। তাতেও কি কম হ্যাপা! শুকোতেই চায় না যে। রস যে কতরকমের তার গোনাগুনতি নাই। একটা নিয়ে এখানে একটু ইয়ে করি। তা হল কাব্যরস। ও বাবা! এত রস থাকতে শেষে কিনা কাব্যরসে মাতামাতি! হ্যাঁ, একটা সুবিধে আছে। বহু রসের সমাহারে এই রসের সৃষ্টি। ফলে চাখাচাখির বিষয়টা একটা অন্য মাত্রা পেয়ে যায়। সে নাহয় বুঝলুম। কিন্তু মার কাছে মাসির গপ্পোটা? আরে বাবা তাই তো। যেমন আমি যা নিয়ে গপ্পো ফাঁদব তাতো সেই সব মায়েদের কাছেই ফাঁদব যারা কোনও না কোনওভাবে নয় একান্তই এর সঙ্গে জড়িত। বলা চলে যমজ বোন হয়ে একসঙ্গে বেড়ে ওঠা। মাছি হলেও ধরা পড়ার ভয় সাড়ে ষোলো আনা।

'আমার চেতনা চৈতন্য করে দাও' এ কবির কত দিনের প্রার্থনা। চৈতন্যে প্রবেশ হলে কি চেতনা জারি থাকে? এমন একটি প্রশ্নও চোরামনে ঢুকে পড়ে। অন্বেষণ জারি থাকে কি তখনও? সংশয় কাজ করতে থাকে। চেতনা থেকে চৈতন্যে প্রবেশ যদি একটা প্রক্রিয়া হয়, তাহলে তার একটা মধ্যস্তরও তো থাকতে পারে। সেখানে তো অন্বেষণের চাহিদা কম হলে চলে না। আমার কি এখন সেই স্তরে অবস্থান? নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করি। কী খুঁজি? আনন্দ, রস, জীবন, ভালোবাসা। এসব চাইলে নিজেকে প্রস্তুত করবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আমি প্রস্তুত হতে চাই। কোথা থেকে রসদ মিলবে? যত্রতত্র? হয়ত তাই। কিন্তু একটা মিশন থাকলে বিশেষ কিছু বেছে নিতে হয়। আমি বাছলাম কবিতা। কবিতা আমাকে একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে চৈতন্যে নিয়ে যাবে। চল পানসি চল উড়ুক্কু চল পদযুগল।

চলতে চলতে কত পথই না পেরিয়ে আসা গেল। কবিতায় ছিলাম তো? কবিতায় আছি তো? কবিতায় থাকবো তো? আবারও প্রশ্ন আবারও সংশয়। প্রশ্ন থাক, থাক সংশয়। নেতিবাচক উত্তর খুঁজে লাভ নেই। কবিতা কে ঘিরে আমার আবর্তনে আনন্দ যে পেয়েছি, রস যে মিলেছে, ভালোবাসা যে জাপ্টে ধরেছে তা অস্বীকার করব কোনমুখে? কবিতার কাছে ফিরি। মায়ের কাছে মাসির গপ্পো করি।

অনুরাগ কিছুটা বায়াস্‌ড করে দেয়,জানি। কবিতানুরাগের ক্ষেত্রেও কথাটা প্রযোজ্য। বায়াস্‌ড হওয়া গপ্পে তাই একমুখীনতা থেকে যেতে পারে। সেজন্য ক্ষমাপ্রার্থনা নৈব নৈব চ। কেননা আমি এখন কবিতা পাঠের এমন এক পরিসরে আছি যেখানে খোলা আকাশ বাতাস যথেষ্ট বইছে দমবন্ধ করা কোনো প্রাচীর নেই, নেই আটকে পড়ার কোনও চিহ্ন। এমন এক সময়কালের পাঠ যা আমার গ্যালপিং চিন্তা ভাবনাকেও প্রায়শই আচ্ছন্ন করে দেয়। যা শুধুই অনুভূমিক থাকতে ভালোবাসে না, হতে চায় লম্বানুক্রমিক, আর চেতন স্তরটিকে যেন আশ্বস্ত করতে চায় এই বলে- - - ইন্দ্রিয়াতীতও অনুভূতির জন্ম দেবে এইবেলা।

খোলা রাখছি এরিয়েল, কোথাও প্রিকনসেপশন নিয়ে এগিয়ে যাওয়া নেই। ধারনা কে দেব অবাধ মুক্তি। ইতিহাসকে মাথায় রাখলেও ইতিহাস বন্দী হয়ে পড়ব না। ঐতিহ্যছুট হতে যত বাধা কষ্ট ঐতিহ্যের টান থেকে তাকে দেখা যায় না কি? আবেগ যতটাই ঐতিহ্যের কাছে হাঁটুমুড়ে থাকে মস্তিষ্ক ঠিক ততটাই ঐতিহ্যছুট হতে আস্কারা দেয়। অবাক করে দেয় তখনই যখন এই দুয়ের মধ্যে রীতিমত সেতু জুড়ে কবিতার ডালপালা মেলা হতে থাকে। বোধ হয় এও এমনই এক আশ্রয় যাতে ভরসা করা যেতে পারে। পরম্পরার পায়ে কোনও বেড়ি নয়। পরম্পরা একদিকে যেমন অবধারিত প্রায় সেখানে বাঁক, গভীর বাঁক, মায় লাফও সম্ভব। কোনও জল অচলের ব্যাপার নেই। আন্দোলন আলোড়ন এত নৈমিত্তিক। হতে থাকে। গোষ্ঠী, ম্যানিফেষ্টো (লিখিত, অলিখিত) আসে পায়ে পায়ে। কবিতার গায়ে লাগে ঝারণ পোছনের ছাপ, কবিতার মননে লাগে ভিন্ন ভাবনার রঙ রস গন্ধ আর স্পর্শ। আবার যখন গোষ্ঠীই অসাড় প্রায় গোষ্ঠীর জায়গা ভরাট হয় এক এক ইন্ডিভিজুয়ালে তখনও ঝার- পোছ চলতেই থাকে, রঙে পড়ে নতুন পোঁছ, রসে লাগে রস, গন্ধ খুঁজে পেতে চায় তার নিজস্বতা, আর স্পর্শের শিহরণ সেও বড় কম মনে হয় না।

রসের কথা বলছিলাম। রসের সন্ধানে অনেক সময়ই তরুন প্রজন্মের কবির কবিতায় দেখি কেমন একটা কাঠখোট্টা ভাব। মেধা আছে, বুদ্ধি আছে, আছে জ্ঞান- বিজ্ঞানের প্রচুর তথ্য, অভিজ্ঞতা কম নয়, মেকিং এ খামতি নেই, তবু যেন রসহীন শুকনো আমসি বা বহু পুরোনো হরিতকি। কিন্তু আমি এখানে বেছে নেব এমন কিছু তরুন কবির কবিতা যাতে রসানুভবে আমার ঘাটতি পড়ে নি।

অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়ের একটি কাব্যগ্রন্থ ‘লোডশেডিং’। এই বইটির রস আমসত্ত্ব। পাকা রসাল ফল নয়, এবারে চাই দুধের যোগান, সে আছে তার তরলতায়, প্রয়োজন একটি কদলীর, সে আছে ‘প্রেম’ এই শব্দটির মায়ায়, জরুরী ‘দলন’, সে প্রতিটি ‘মনে হওয়ায়’, ‘মতো’তে, ‘যেন’তে আর কর্ম কে কর্তায় আর কর্তা কে হেলায় কর্মে পরিণত করার মুন্সীয়ানায়, আছে ‘ছিল আছে থাকবে’ কে এক সময়কালে আত্তীকরণ করায়, আর আছে ‘র- মেটেরিয়েল’ সংগ্রহের সার্বজনীনতায়। ব্যাস আর কী চাই? এবার আমাদের মত পিঁপড়ের পাতে হেঁটে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, আর দূরবর্তী মাছি হিসেবে হাপুস. . .

যে মজাটা ফল্গুর মত এই বই- এ বইছে সে মজাটাই অফুরন্ত রস। লোডশেডিং কে নিয়ে এত মজা,

এত নিজেকে দেখা, চারপাশটা দেখা, এত ভাবনা চারিয়ে দেওয়া সত্যি বলতে কি আমার সেভাবে আগে দেখা হয়নি বা অনুভবে আসেনি। এখানে পরিচিত দ্যোতনায় মেকিং এত ব্যঞ্জনাময়, এত ব্যাপক অভিঘাত সৃষ্টিকারী, এমন সুরেলা কঠোর, এতই শ্লেষ আশ্লেষের হাত ধরাধরি, আশা ও আশংকার এমন আষ্ঠেপৃষ্ঠে বাঁধাবাঁধি, এমন তরল চটুল গতি আর এমন উথল উৎসেচন যে কবিতা পাঠের পর 'মাম' হয়ে যেতে হয়।

" বাঘের গায়ে লোডশেডিং আঁকছে অন্য বাঘ
সারসের গায়ে সারস লিখছে অন্য সারস
তাই শহর থেকে দূরে অন্য আলিপুর
মাছের গন্ধে স্থির অল্প ঝিল।

সার্ভের মতো বৃষ্টি পড়ছে সাবধানে
টাউনের এদিক ওদিক
জুতোর সোলে আটক টুকরো টুকরো খটকা
ব্রিজ নির্মাণের যাবতীয় উপাদান, নরম উড পেন্সিল।

এই বিকেল ন্যাড়া ছাদ থেকে দ্রৌপদি লাগছে সুতোয়
আর ঘুড়িটি সুদূর
ফেরার পথে নিয়ে এল আস্ত সাইবেরিয়া
এখন রাত
সিঁড়ির তলায় বাঙালি লাটাই শুয়ে আছে পথভ্রষ্ট মার্ক্সের সাথে

গাছের গায়ে সালোকসংশ্লেষ বোলাচ্ছে অন্য গাছ
একটু একটু করে আলিপুর ফুটছে. . . "। (লোডশেডিং—২২নং কবিতা)

অনিমিখ পাত্র। কাব্যগ্রন্থ 'কোনো একটা নাম'। 'কোনদিকে সে যাবে' এরকম একটি প্রশ্নমূলক সংশয় নিয়ে বইটির শুরু। পরের কবিতাগুলোতেও 'আমি'কে নানাভাবে প্রশ্ন করে উত্তর খোঁজার চেষ্টা হয়েছে। অনেক সময় প্রশ্নটা ঘিরেই নির্মাণ। প্রশ্নগুলোর মধ্যেই মজাগুলো লুকোনো। কেননা কবি কখনই এর তাৎক্ষণিক উত্তরদানে প্রবৃত্ত হয়ে তাকে সরলরৈখিক করেননি, বা কোনও কনক্লুশানের প্রবনতা দেখাননি, ফলে যে যেমন ভাবতে পারে গোছিয় রসের উদ্ভব হয় বহুরূপতার সরনীতে। টেক্সট্ এখানে জবর ওজন নিয়ে কখনই নেই। একটা চলমানতা আছে, আছে দৃশ্যকল্পগুলোর ছবির ভনিতা ছেড়ে ছবি থেকে রস ছড়িয়ে দেওয়ার আকূলতা। ফলে ভাবনার বিস্ফার ঘটে চলে অনিবার্যতায়। কয়েকটা প্রশ্নের উদাহরন না দিলেই নয়। 'শ্রেষ্ঠ তোলপাড় থেকে ছিটকে আসে ক্ষার নাকি মধু?', 'উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকার নামই কি শিল্‌প?', 'ধুয়ে মুছে দিলেই কি নতুন হয় জুতো?' ইত্যাদি। স্মৃতি আর স্মৃতিনির্ভরতা এক নয়। স্মৃতিনির্ভরতায় স্মৃতি- বুঁদের প্রশ্ন আসে। এখানে স্মৃতিকে

ঝলক হিসেবে ব্যবহার করে সামনের দিকে সমস্ত পথটাই খুলে দেওয়ার বা তাতে চলা শুরুর আমেজ আছে। এবং এটা যে সরস ভঙ্গীতেও করা যায় তার উদাহরন এই বই। এখানে একটি কবিতা।

‘‘ লিখতে লিখতে ফুরিয়ে গেল লিপি
রুটিবেলার ঈশ্বরহীনতা
বাতাস এনে দেয়
শরীর উঠে পড়ে লেগেছে
শরীরের ভেতরের কথা এমনসময় মনে হয় কেন
বস্তুত, আগামী উন্মাদনার কাছে যাই
দেখি বাড়ির কী দশা!
সামান্য ভগ্নাংশ, সহজ গুণের ছাপছোপ
আশকারা টুকতে টুকতের বেলা যায়
হৃদয় কি একটা ইন্দ্রিয়? তার দায়িত্ব থাকে?
যোনিশব্দ, লিঙ্গশব্দ ঘুরে বেড়াচ্ছে বাইরের ঘরে
একতারার গায়ে দোতারা লাগছে
দুই চোখ বুজে আছে রান্নাপ্রনালী
বাতাসে ঘামের গুঁড়ো
চোখে পড়ছে না’’। (ভণিতা)

অনুপম মুখোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থের নাম ‘অনুপম% মানুষরা’। নামে কি বিশেষ কিছুর দ্যোতনা খোঁজা ঠিক? আমার তেমন মনে হয় না। নানা রঙীন ফুলের মালা গাঁথা এই বইটায়। কারও সঙ্গে কারও কোনও সূত্রতা নেই। সবই স্বমহিমায় তার রঙ রস জ্ঞাপন করছে। সেলাই নেই। কী যেন বলতে চাওয়াই অনুপম। অনুপমের কবিতা। যে কোনও ভাবনাকেই বিষয় করা আবার বিষয় ভেঙে ভাবনা চারিয়ে দেওয়ায় অসম্ভব মুন্সীয়ানায় এই কবি ভীষণ রকম চঞ্চল। স্থির হয়ে বসা নেই। একটা অলিখিত গতি একের পর এক দরজা খুলে ধরে। সংশয়ের ওপরে থেকে তার দৃঢ় বলা পাঠককেও অনুভূমিক রেখায় নামিয়ে আনে। তার কবিতায় এক সমুদ্র চলন। এক একটা ঢেউ ওঠে উচ্চতা বাড়ায় ভেঙে পড়ে, আবার একটা ঢেউ কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবেই তার উপস্থিতি জানান দেয়। এই ঢেউ এর পরে ঢেউ ভাঙাটাই তার নির্মাণ বিনির্মাণ। আর ঢেউ এ দুলতে দুলতে কবিতা রসে মজতে থাকে পাঠক। বলতে চাওয়াকে সে কখনই ভারী করে না, আর বলার চেয়ে না- বলার ফাঁকটুকু ঝুলিয়ে রাখে যে কোনও পরিসরে। পাঠক সাময়িক খেই না পেলেও নিবিড় পাঠে তন্ময় হয়ে ওঠে। কান্না ঘাম রক্ত দেখতে পাই না, দেখতে পাই না সুর বা সুরেলা কিছু, তার কবিতায় আছে প্রেম বিতৃষ্ণার মেলবন্ধন। আছে মাইক্রোস্কোপিক সংবেদনশীলতা। তার কবিতা লিরিকের মোহজালে আবদ্ধ নেই, বড় খাড়াখাড়ি আর নৈর্বক্তিক। এমন নৈর্বক্তিক থেকেও কবিতায় মিহি রস বোনা যায় এই বই পাঠ না করলে জানা হত না। এখন সে পুনরাধুনিকে আছে। কিন্তু পূর্বপ্রকাশিত এই বই আধুনিকের এক চূড়ান্ত রূপ হিসেবেই আমার কাছে ধরা দিয়েছে। আর সেখানেই রস জাগিয়ে রেখেছে কী যেন বলতে

চাওয়ায়। নাম কবিতাটাই এখানে উল্লেখ করি।

" অনুপম % মানুষরা কাহিনির মানুষ

বসন্তকুঞ্জের নিচে
শুয়ে আছে প্লাস্টিক মানুষ

পাশে তার হুঁকো আর সবুজ ল্যাপটপ

তার দুর্দান্ত শায়িত বুক
একজোড়া আপেলনগর হতে পারে
কেশগুচ্ছে আবৃত জাদুবিন্দুগুলি. . .

অর্ধনারীশ্বর

সবই হতে পারে
ইচ্ছায় কাহিনিতে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার সুযোগ নেই আর

উহার প্রতি শ্বাস হারাইও না. . . (অনুপম % মানুষরা)

অমিতাভ প্রহরাজের কাব্যগ্রন্থ(?) 'অন্যব্যাপার'। সত্যিই ব্যাপার স্যাপার অন্যরকম। কবিতা আছে, গদ্য আছে কবিতার খুব কাছাকাছি (গপদ্য), ক্যাপশন সহ ছবি আছে, বাংলা কবিতার বই- এ কয়েক পৃষ্ঠার ইংরেজিতে লেখা আছে, লিপি আছে। সব মিলিয়ে একটা প্রোডাকশন। ভাষাটাই একদম রসালো অন্যরকম ব্যাপার। মনে হবে বে- আক্কেলে। একি কবিতার ভাষা হতে পারে? আমার মনে হয়েছে হতে পারে এবং হয়েছেও। সাধারণ সব শব্দ এমনভাবে বসানো বা সাজানো যে সার্কাসের ট্রাপিজের খেলা মনে হয়। ফলে একটা ভয় ভয় ভাব, কী ঘটে কী ঘটে! দুলকি চালে ভাষাটি চলে কিন্তু গতিময়। গতির সঙ্গে আবেগের একটা প্রচল মিল তো আছেই। তা আবেগ আছে এখানে। তবে মজাটা এই, সে আবেগ যতটুকু না ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তার চেয়ে কম কিছু ঠোক্কর দেয়নি। ঠোক্করটা রসে ভরপুর, আরেকবার পাঠে প্রানিত করে। আবেগ আবার একটু বিষয় মাখানো। বিষয় আছে না- বিষয়ীর বিষয় হয়ে। বিষয়ে বশিভূত নয় এমন। যেন রামকৃষ্ণ কথিত সংসারে থাকা পাকাল মাছের মত। আসলে কী যেন কিছু একটা ঘটিয়ে চলার কথনে, পুরোটাতো নয়ই, এমনকি ইঙ্গিতগুলোও সবসময় খোলসা করা নেই। এই ঘটিয়ে চলা বিষয় হলে ক্ষতি কি? নেইই তো। মজাটা আছে পুরো, দ্রৌপদীর শাড়ী আর ফুরায় না। কত হালকা পুলকা শব্দ, এমন তেমন তুর বোধহয় ইত্যাদি ইত্যাদিকে স্রেফ কর্তা বানিয়ে ভজনা, মানে তার খানা- দানা- শোনা র ফ্রি ব্যবস্থা খুব বেশি

দেখি নি আগে। এসবও কেমন একটা মাত্রা পেয়ে যাচ্ছে, ভাব ও ভাবনাটা বজায় রেখে। এখানে দেখেছি পার্শভাবনারাজীর খেল। যেন পাশাপাশি থাকা সমূহ ভাবনা তার জায়গা ধরে নিচ্ছে অবলীলায়। আর তাতেই অবধারিত গতি আর দিকনির্দেশনার ইঙ্গিত। গদ্য পদ্য কবিতার সীমারেখাটাকেই চ্যালেঞ্জ জানানো আছে কবির নিরীক্ষার নিজস্বতায়। অন্যব্যাপার হয়ে না উঠে তার উপায় ছিল না। কবিতা যে কোথায় নিয়ে যাবে হে প্রিয় প্রকৃত পথিক!

" তুর হতে কে না চায়, শুধু
আমারই তুহার হতো কাউকে দেখলে
বোঝো দুপুর; বোঝাতে চাইব কিন্তু সেন্টিমেন্ট
ঝাল দেওয়া রোদের গ্রেভিতে ভিজেছে ভুবন
হাঁটতে হাঁটতে আমি ইদ- উল- ফিতর হয়ে গেছি
হাত ধরতে দিলে
বোঝো বিকেল; বোঝাতে চাইব কিন্তু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং
পানিফল ভাঙা আলো এই শুক্লপক্ষিনীতে
আমাকে তুই দিয়ে গুন করো
তুই গুনফলে মাঞ্জা হারালো
হারানো মাঞ্জার খোঁজে এক একটা রাত
এক একটা দারোগা হয়ে উঠেছিল. . . "। (১০ নং কবিতা, পৃ- ৩০)

অরিত্র সান্যালের কাব্যগ্রন্থ 'আজ কারও জন্মদিন নয়'। আজ এবং এক অনাগত ভবিষ্যতের মায়ায় জেগে থাকে তার কবিতা। শব্দ এখানে মুখ্য নয়, বাক্যে বাক্যে এগিয়ে যাওয়ায় সমস্ত ইঙ্গিতময়তা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। আবেগকে তিনি মথিত করে রেখেছেন সূক্ষ্ম মায়াজালে। অনেক কথা আছে, কথাকে সংহত ও সজ্জিত করার ব্যবস্থা তিনি নিয়েছেন এক একটি কমপ্যাক্ট ডিস্কে। ডিস্কে সাজানো সেই বাক্যমালায় এক একটা বিশেষ বিশেষ সুর ভেসে থাকে। প্রেম ও বেদনা, কষ্টানুভূতি ও সান্তনা, আনন্দ ও বহির্জগতের টানাপোড়েন। কখনও রাগ উঠে আসে, সে রাগে ক্রোধ উজ্জ্বল নয়, অনুরাগ সমন্বিত। নিজেকে অদ্ভুতভাবে চিনতে চাওয়ার মধ্যে বারবার তিনি নিজেকেই আবিস্কার করে চলেন। আর এই আবিস্কারের উদ্ভাবনায় অসম্ভব রস সৃষ্টি। রাগটা বহিরাস্তরণেই সীমাবদ্ধ, ভেতর থেকে এক সুরম্য নদীর স্নিগ্ধ কলতান তার কবিতায় এক ধরনের মোহজাল ছড়িয়ে দেয়। কবিতাটা শেষ না করে পাঠক থামতে পারেন না, এমনই রসশৃঙ্গার। অনেক সময় এমন কিছু স্টেটমেন্ট ব্যবহার করেছেন যাতে মনে হতে পারে বিবেচ্যকেই প্রাধান্য দেওয়া আছে, কিন্তু পরমুহূর্তেই তা ভেঙে বেরিয়ে আসা আছে চলমান জীবনের নানা অনুষঙ্গে। নিজেকে উজার করে দেওয়ার এই প্রবনতা কবিতায় ছড়িয়ে আছে যা থেকে পাঠক নিজেকেও আবিস্কার করতে পারেন। আর কবি ও পাঠক একসূত্রে এলে তার চেয়ে ভালো আর কিছুই হতে পারে না। বিষাদ আছে, বড় লঘু তার চলন, একদম ভিন্ন মাত্রায়। ভাষা বহমান, যা তিনি উচ্চারণ করেন একদম তাকে সঠিক দিকে বয়ে নিয়ে যায়। রাগ আর রস মিলেমিশে একাকার। এখানে বইএর প্রথম কবিতাটাই তুলে

ধরি- - -

“ যে ছায়া পড়েছে
তাতে বেসামাল হয়ে ওঠে পুকুরের জল
আমি এ নিরুদ্দেশ তলিয়ে দেখছি
এক মাছের অনর্গল দিন
নিবারণ, এসো ভাই সত্বর
দূরে দূরে তোমার আবেগগুলো দেখা যায়
ঝুঁকে আছে
অভাব পেয়েছ আর বমি পায় বোঝো চিন্তাসূত্র এযাবৎ
এখানে কাঁকড় নুড়ি
ব্যথা চিনে গেছ
অনেকটা রাস্তা দেখো
জল ও জালের মাঝে
নিবারণ
তুমি ফিরে এলে
আকরে শিকড়ে
ছায়াদের ছমছম হয়”। (আকর)

অর্ঘ্য বন্দোপাধ্যায়ের কবিতার বইএর নাম ‘ডিসেম্বর সংহিতা’। খুবই পরিমিত শব্দে কবিতা লিখতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন কবি। এত পরিমিত যে অনেক সময়ই তাল রাখতে পারা যায় না। অন্যদিকে পঙক্তির পর পঙক্তিতে শুধুই নতুন নতুন দরজা খুলে ধরা আর অনাহূত অমিল অপ্রত্যাশিত অনভিপ্রেত পাওয়া। দুই পঙক্তির ফাঁকে, দুই শব্দ ও শব্দ- বন্ধের ফাঁকে এত পরিসর যে পাঠক সম সংখ্যক কবিতা করে ফেলতে পারে। নাগরিক যাপনের অনুষঙ্গগুলি শব্দের আখরে এনে উপস্থাপিত করেছেন। অতি ব্যবহৃত শব্দও যখন তার কলম দিয়ে বেরিয়ে বাক্য বা বাক্যবন্ধ তৈরী করেছে বা ভাবনার রূপটিকে মেলে ধরেছে তখন মনে হয়নি শব্দটি আর আটপৌরে রইল। অনেক টুকরো টুকরো কল্পছবি আছে যা রেখায় নয় শব্দেই তার মায়াবী রূপ মেলে ধরেছে। এই উপমাহীন ছবিগুলি নানা চিন্তা চেতনার জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা ধরে। তার কবিতার গঠনপ্রনালীর পরতে পরতে লুকিয়ে আছে রস। আর আছে চারপাশের নানা অভিজ্ঞতার ঘাত- প্রতিঘাত, যা পাঠক তার নিজের চারপাশের সঙ্গে মিলিয়ে অনুভব করে এক আশ্চর্য মজা পান। পরিমিত কথন যেমন আবেগও পরিমিত। কোথাও উচ্চকিত স্বরে কিছু বলা নয়, এক নিচু স্বর এবং সুর। লিরিকের ছোঁয়া আছে। বড় সচেতনতার সঙ্গে ব্যবহৃত এই লিরিক কোনও প্রথাগত অবস্থান থেকে উঠে আসেনি। এসেছে যাপনের অভ্যন্তর থেকে। একটা কবিতায় মনোনিবেশ করা যাক- - -

“ একটি মাত্র চাঁদ
দরজায় তুলনাহীন

বয়স ক্রমশ ফিতে
জলে ধোয়া
ও কে বসতে দাও
ওমলেটের প্রতিশব্দ
পিছলে কোথায় যাবে?
তাতে লেখা আছে
ঠোঁট তুমি যেন
বাড়ি ফিরবে না” (দু ফোঁটা দুঃখের কবিতা)

ইন্দ্রনীল ঘোষের কাব্যগ্রন্থ ‘লোকটা পাখি ওড়া নিয়ে বলছে’। ইন্দ্রনীলের কবিতা পড়তে পড়তে মনটা কেমন আলতো হয়ে যায়, যে মন নরম হয়ে আসে আর বিস্তৃত হতে শেখে। কবিতায় কোনও চটকদারিত্ব নেই। ভাষায় নেই মার- প্যাঁচওয়ালা দেখনদারি। শব্দের কোনও গায়ে পড়াপড়ি বা উথাল- পাথাল নেই। শুধু ভাবনাকে বিস্তৃত করে যাওয়াতেই সহজ নির্মাণটুকু। কিন্তু এই আপাত সহজতার মধ্যে অসম্ভব এক রোম্যান্টিসিজম্ উছলে আছে, টের পাওয়া যায়। জীবনের বহু ক্ষেত্রের চিরকালীনতাকে খন্ড খন্ড নির্দেশ করে। যেমন ভালোবাসা, যা চিরদিন ভালোবাসাবাসিতেই গমন করে চলে। বেদনার্ত হতেও আনন্দ হয় অনেক সময়, এবং এখানেই রসের সঞ্চার যা ভিজিয়ে দেয়। টুকরো ছবি কেমন অমোঘ হয়ে ওঠে। ছবিটা হয়ত সত্য। অনেকেরই দেখা। এখানে দেখাটা ভিন্ন ভঙ্গীর, দেখার বলাটা ভিন্ন মাত্রার, দেখার উপস্থাপনা প্রচলিতকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বসে। তাই ছবিটার মুন্সীয়ানায় হাজার ক্যানভাস, হাজার রঙ, হাজার আঁচড়। ফলে ভাবনায় একটা প্রচন্ড লাফ ধরা পড়ে, যা গতানুগতিক রোম্যান্টিসিজম্‌কে ছাড়িয়ে এক অপর পথে গমন করে। কবিতা পাঠের শেষে এক নিঃশব্দ শ্বাস নিঃসরিত হয়ে যায় মন কেমন করার মধ্য দিয়ে। ইন্দ্রনীলের কবিতায় কচিৎও বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যাবে না, থাকার কথাও নয়। কখনও সুতোয় ধরা পড়ে অশক্ত কাহিনীডোর আর তা কবিতার মধ্যে এমন লীন হয়ে থাকে যে তা কখনওই প্রাধান্য পায় না। অন্তরের গভীর অভিজ্ঞতাগুলি নানা অনুষঙ্গে এমন বয়ানে উঠে আসে যে তার স্বতন্ত্র স্বর আমরা শুনতে পাই। শব্দের নতুনতর গতি ও ভার নিয়ে নির্মেদ তার ভাষাবয়ন। চলাপথের নতুন নতুন চিহ্ন এবং নির্দিষ্ট কোনও ব্যাকরণহীনতাই তার পথ আলো করে আছে। আর এই নির্মাণের মধ্যেই গভীর গভীরতর রস আমাকে মোহিত করে।

“ এমন একটা দরজার কথা ভাবি
যা গান দিয়ে খুলে যাবে
চাবির বদলে
কাঁধে চাপবে গুপি বাঘা
খুব খুব বীয়ার হতে হতে
ফেনাদের নক পড়বে দরজাতে
চুরির দাগ- - -
কিন্তু কিছুতেই খুলবে না

যতক্ষণ না গুপি গাইবে
রুমালি রুটির সা রে গা- এ
কেমন আঁচড় পড়বে

আমি তখন শাজাহান বাইছি নদীতে
এখানেই একদিন মোগল সাম্রাজ্য ডুবেছিলো
এখনও জোনাকি জুড়ে
ভূতের গল্প স্কুলে যায়. . . ” (গান দিয়ে দ্বার খোলাবো)

দেবাঞ্জন দাসের কবিতার বই ‘বিল্লিবাদল’। এই বই এর কবিতাগুলি এক নিশ্বাসে পড়ার মতন। খুবই গতিময়। যদিও প্রচুর নতুন নতুন শব্দের অবতারণা আছে এ বই- এ। কিন্তু ঠোক্কর খেতে হবে না, বড্ড মানানসই। আর এ বইএর সম্পদ হল বলে যাওয়ার ধরণ। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা যেমন আছে সঙ্গে আছে টুকরো টুকরো পঙক্তিতে কবিতাকে উদ্ভাসিত করা। এই দুই বৈপরীত্য তিনি সামলেছেন অসম্ভব দক্ষতায়। আর এই গঠনেই রস সৃষ্টি। অনুভবগুলি সোজা রাস্তায় না চলে তীর্যক একটা প্রক্ষেপন সহ আড়ালে আবডালে রয়েছে যথেষ্ট। চারটে সিরিজ কবিতা আছে বইটিতে। জীবন ও যাপনের আলো এসে পড়েছে তাতে। অনেক কঠিন কঠিন ভাব ও ভাবনা ডানা মেলেছে, কিন্তু তাতে কোনও ভারবোধ নেই। ভারবোধ থাকলে গতিটা বজায় থাকত না। গ্রাম জীবনের অনেক অনুষঙ্গ এখানে ছড়ানো ছেটানো। অনেকসময় মনে হয় চিত্রগুলি অসংগঠিত এবং ভাঙা ভাঙা। আসলে চিত্র ফুটিয়ে তোলার কোনও দায় নিতে চাননি কবি। প্রিজমের ভেতর আলো এসে পড়লে আলো যেমন বিচ্ছুরিত হয়, দেবাঞ্জনের কবিতায় তেমন এক- আধটা ভাব বিচ্ছুরিত হয়ে নানা ভাব ছড়িয়ে দেয়। ঢেউ- এর প্রভাব আছে তার কবিতার চলনে, তবে সে ঢেউ উথাল- পাথাল করা কিছু নয়, একটা নির্দিষ্ট চলমানতায় উচ্চ- নিচ করতে করতে তার এগিয়ে যাওয়া। সেখানেও রসের ঝলক। আমি ব্যাক্তিগতভাবে চিনি কবি দেবাঞ্জন দাস কে। তিনি ফিল্ম- এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে। কিন্তু এই বই- এ অভিপ্রেত তার কোনও নগদ উপস্থিতি আমার চোখে তেমন পড়েনি। কবি যেন অসম্ভব সচেতনভাবে রচনা করেছেন বইটি।

“ অনেক ধানচাষ আর
বকফুলের বড়া হল
এবার ন্যাটিকেলে খেলব মনে কর
স্টিমার পেরোবে
আর তুমি জল মাপবে

ঘুম থেকে উঠে জল
প্রথম চা- সিগারেটের পর জল
এত জলে পেট মোচড়ায়

স্যুসাইড পায়

যেন নদী আঁকা
মাছ দু এক ঝাঁক
নীল ভাসছে আর
একে একে মাছেরা চক্ষুদান করছে. . .

দূরবীন ভোকাট্টা
সুতো বরাবর
দোলের চশ্‌মে বদ্দুর
গাছপালা থেকে তাই চশমা সরাই
আজ দেখা নেই
নেই গন্তব্যের পুশ- আপ
হেজি- পেঁজি এক টম্বুর করছে টই টই
এসো অতিকথনে বসি
সোলো থামিয়ে দেখি একই চৌপথী বারবার. . . ” (তোমাকে লেখা- ১১)

নীলাব্জ চক্রবর্তীর কাব্যগ্রন্থ ‘প্রচ্ছদশিল্পীর ভূমিকায়’। তবে কি এই বই এ কবি নিজেই প্রচ্ছদশিল্পীর ভূমিকায়? কথাটা অনেকটাই সত্য। অনেক অনেক ছবি আঁকা আছে। ছবিকে কলমের অক্ষরে কথা বলিয়েছেন তিনি। সবসময়েই যে ছবিগুলি বাস্তবকে রেফার করে, তা নয়। ছবিগুলির অধিকাংশই উঠে এসেছে মনন থেকে, বলা যেতে পারে কল্পচিত্র। ছবির কোলাজে গড়ে ওঠা এই সব কবিতায় শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য পেয়েছে কবির মনন, যা তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা বলে। সেই অভিজ্ঞতায় কোনও ভারবোধ আমাদের নুইয়ে দেয় না, বরং বিষয়ের একমুখীনতাকেই আক্রমন করে। একটি অংশের নাম ‘সিনেমাত্রা’। বোঝা যায় এই নামকরণের প্রতিও তিনি সুবিচার করে চলেন। যেন খন্ড খন্ড এক একটি চিত্রনাট্যকে কবিতার মোড়কে তুলে ধরতে চান তিনি। এবং এই কাজটা সুচারুভাবে করায় তার রসবোধের তারিফ করতেই হয়। ভাবনাকে রসের ভিয়েনে জাগিয়ে তোলেন আর ‘উইট’এর দোলায় দুলতে থাকি আমরা। কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে অনেক গানের পঙক্তি এবং মানিয়েও গিয়েছে। সঙ্গীতের পঙক্তি থাকলেই তা লিরিক- এ পর্যবসিত হবে এমনটা নয়। কিন্তু বইএর শেষ অংশের নাম দিয়েছেন ‘লিরিকবাস’। সেখানে কিন্তু প্রথাগত লিরিক দেখতে পাই না। কিন্তু লিরিকের আমেজ ছড়ানো- ছেটানো আছে। সব মিলিয়ে কবি নিজেই এক প্রচ্ছদশিল্পীর ভূমিকায়, যার আঁকায় গানে সিনেমায় লিরিক- এ শুধুই আড়ালে থেকে যাওয়া। একটা কবিতা- - -

“ না- হওয়া সম্পর্কগুলোর বীজ
কোথাও বেড়ে ওঠার কথা
বৃন্দাবনী
খুলে রাখা আছে

প্যান্টি
শব্দটার ইলাস্টিক টান

- - - - >>> - - - -

যা বরাবর আমায় পুরনো লেখাগুলোর
কাছে নিয়ে যাচ্ছে
কুমোরপাড়া আঁচ দিচ্ছে লালচে বিকেল
আপনার গোধূলিগগনে মেঘে মনে পড়ছে না
বরং নষ্টাদশী শব্দটা দূর থেকে ভাবুন
বরং ভাবুন আমি তখন
আর লতানো ব্যাকগ্রাউন্ডে

রূপোলি সওয়ার
... এ গান, তোমাকে
শোনাতে. . . ” (লতানো)

রমিত দে র কাব্যগ্রন্থের নাম ‘মার্জিনের কাকাতুয়া’। রমিত যে কবিতা লেখে তা এক একটি ‘টেক্সট্’। আবেগের তৎপরতার চেয়ে দেখার ঔজ্জ্বল্য বেশি। লোকে দর্শন বলতেই পারে। আমি বলি, দেখা, দেখাকে রিলেট করা, যদি বেজে ওঠে এক সমলয়ে! শুধু নিরুচ্চার বলে যাওয়া নয়, মাঝেমধ্যেই মোচড়, কবিতা ঝমঝম, কবিতার মধ্যে কবিতার ডালপালা। শুধু পাশাপাশি রেখে চলাই নয়, তর্কও উঠে এসেছে। চলা ধীর লয় থেকে তার দ্রুততা বাড়িয়েছে। আর দ্রুত যেতে যেতে বলে নিতে চাওয়া এক বিন্দু থেকে আরেক বিন্দুতে। গল্পের ছোপ আছে, খন্ড খন্ড, অনেকটাই কোলাজ। চারপাশের চলমান জীবন যাপনের চিত্র উঠে এসেই মিলিয়ে যাচ্ছে চৈতন্যের সড়কে। রাজ- অর্থ- সামাজিক নীতি যাই নাম দিই না কেন তার। প্রথম জীবন থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে দ্বিতীয় জীবনের অভিসার, আবার উল্টোমুখেও ঘটছে পদচারণা থেকে উড়াল। আর এই দুই- এর জায়গা বদলে বেরিয়ে আসছে রকমারি সব কবিতা, রসে টইটুম্বুর। অনেকটা উদ্দেশ্যহীনতার মধ্যেই উদ্দেশ্যকে রাখা হয়েছে সচেতনে। এখানে ভালোবাসা বড় মুখ করে কথা বলে না, থাকে অন্তর্লীন। বলতে চাওয়ার অভিমুখ যদি একপেশে না হয়, দৃশ্যতার পরিমন্ডল যদি শুধু বস্তুনিচয়কেই রেফার না করে, শ্রাব্যতায় যদি থাকে একটা সুষমভাব তাহলে মাঝেমধ্যে অতিকথনও কবিতা হয়ে উঠতে পারে, তা কবি করে দেখিয়েছেন এই বই- এ। দূরত্ব এবং কাছাকাছিকে পাশাপাশি নিয়ে আসায় দূরত্বের কারনে এক বিষণ্নতার মিহিসুরও শুনতে পাই, কিন্তু তাতে মুহ্যমান হতে হয় না। এখানেও ছড়িয়ে থাকে রস-সম্ভার।

“ যেমন ধরো, পা
জল সরে যাবার পর
কিছু কাদা লেগেই আছে;
তবে কি ছায়া ধুয়ে গেল?
নাকি বরাদ্দকৃত স্নান তারা নেবেই!

আলোর জং ঝরাতে এত ব্যস্ত, যে ছায়ার দিকের দরজাটা
বন্ধ করার কথা খেয়ালই থাকে না

যারা বাড়ি খোঁজে তারা বনে ঢোকে
বড় করে গোয়াল গুছিয়ে রাখে আগুনের পাশে
ক্ষতস্থান থেকে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঝরে
ঝরেই পড়ে

আমার রুমাল চাপা দিই
আর, নার্সের হাতে ধরা থাকে টুকরো কাগজ

মৃতদেহকে মাঝখানে রেখে
তারা একটা উড়োজাহাজ বানায়. . . ” (পথহারা)

এরা সবাই নিজস্ব স্বরে ভাস্বর। প্রত্যেকেই লেখেন প্রায় আলাদা আলাদা। প্রথাগত ধারাকবিতা এরা লেখেন না। আর সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যা, তা হল, এরা পূর্ববর্তী সময়ের বাংলা কবিতার নানা গতিপ্রকৃতি আন্দোলন আলোড়ন আত্মস্থ করে তা থেকে নিজেদের উত্তীর্ণ করেছেন নিজস্ব ভঙ্গীমায়। পিছুটান নেই, আছে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার নানান সম্ভাবনা। খুবই ভালো লাগে এদের প্রয়াস। এই দশকের আরও কিছু কবির কবিতা ভালো লাগে। পরে কখনও তাদের নিয়ে. . . ।

আমাদের ওয়েব ম্যাগাজিন শূন্যকাল সম্পর্কে আপনার মতামত জানান

আপনার নাম

ইমেল

মোবাইল

মতামত

গত সংখ্যার পাঠ- প্রতিক্রিয়া

Debasis Mukhopadhyay : পড়ুন অনেক ভালো কবিতা, আর বারবার পড়ে আমার মনে হয়েছে এতো ভালো কবিতা লেখেন কি করে আজকের তরুণ কবিরা। শব্দ ব্যবহার, চিন্তায় এরা অনেক এগিয়ে। আমার কুর্নিশ।

Manaranjan R Barman : শুভেচ্ছা

Nilabja Chakrabarti : Sab poRini ekhono... jeTuku poRlaam, sabtheke bhaalo laaglo Bhaswati Goswami-r lekhaa. Hello Bhaswati di... khub khub bhaalo hoyechhe kabitaa...

Ranjan Moitra : আমি দুঃখিত । প্রতিবার পত্রিকা খুললেই হাড়গোর মরা কঙ্কাল আর ভাল্লাগছে না। এ একান্ত আমারি মতামত। কত মানুষের মতে এটাই পরীক্ষা- নিরীক্ষা, সততা, স্থা- বিরোধিতা আরো অনেক কিছু। আমার একেবারেই তা মনে হয় না। এবং আমি তার জন্য একটুও লজ্জিত নই। শুধু প্রিয় বন্ধু ও ভাই দীপঙ্করকে রাগ বা দুঃখ দিয়ে ফেলে থাকলে সত্যিই লজ্জিত।

Mostafiz Karigar : আপনাদের আয়োজন ভাল লাগলো খুব। কবিতার সাথে চিত্রকলার এই যোগ অন্তরকে উল্লসিত করে। আমার কবিতা ছাপার জন্যে মেদহীন কিছু কৃতজ্ঞতা শূন্যকাল ওয়েবজিনের জন্য। শুভ কামনা।

Avinandan Mukhopadhyay : একটি তূণের ভেতর দশটি অনবদ্য তীর। দশটিই বুলস আই করার ক্ষমতা সম্পন্ন। আজ সত্যি আমার তৃতীয় নয়ন খুলে গ্যালো। ধন্যবাদ কবি তানিয়া চক্রবর্তীকে।

Bhaswati Goswami : Onek shubhechchha.....Deepankar ebong aamader shunyakaal er jonye.....aamar porte onekta samay laage....tai motamot pore janabo.....aar Nilabja, buk ta bhore galo re....konodin ato anando pabo, bhabi ni....chokhe jol ese jachchhe.....prarthona koris kobitar ei anando jogne jano chirokaaler shorik thakte pari.....

Sprezza Tura : Kath Badam is a stunning depiction of everything that is metaphysical. Amrita Nilanjana, your work probably makes you an auteur and rocks our conscience to a degree that would make at least me revisit the poem over and over again. The way you have subtly woven into your work the 'stream of consciousness' reminds me of Virginia Woolf. I don't have tears in my eyes; neither a smile at the corner of my mouth. After reading your work, I could only place a hand on my heart to feel that the heart indeed beats for a lifetime that we all want to live and leave behind. You have turned the obvious on its head to flash us an incisive peep into the vignettes of a parallel existence that most of us thrive in but hardly choose to care for. Simply amazing! In fact, the more I read the wail of the almond, the greater is the feeling that this work can be the marquee of all Indo-Anglican anthologies.

Hasnat Soyeb : আমার 'কাঠবাদামের কান্না' লেখাটার অনুবাদ মূল লেখাকে ছাপিয়ে গেছে। বেশ ভালো লাগতেছে। কয়েকবার পড়লাম। লেখাটাকে নতুনভাবে আবিস্কার করলাম। শুভেচ্ছা অনুবাদক অমৃতা নিলাঞ্জনা। শুভকামনা Shunyakaal .

Pijush Biswas : দিলীপদার অনুবাদ কবিতাটা আমার ভালো লেগেছে, মূল লেখকের কবিতা আমি পড়িনি, কিন্তু তার জন্য আপসোসও নেই, বরং এটা একটা নতুন সৃষ্টি বলেই আমার কাছে মনে হয়েছে...আর একটা ব্যাপার, কবিরা যত ভালোই লেখুক, সম্পাদকের মুল্যবান যোগদানের কথা বার

বার মনে পড়ে যায়, যে ভাবে ছবিগুলোকে রিমিক্স করে, কবিদের যে ভাবে কবিতা লেখায়, এও এক ধরনের 'না লেখা' পরমাধুনিক কবিতা।

Agni Roy : তানিয়া চক্রবর্তী- র কবিতা আদেখলা শহরের মুদ্রাহীন চাঁদ - - keya bat ...khub bhalo kaj,..ekta chora chondo toiri hochhe bhetor theke ebong baire ese chhobol dichhe....aro porte chai apnar lekha.

Shantanu Kabeer : তানিয়া চক্রবর্তীর কবিতাই আগে পড়া হল, সব কবিতার আগে। আচ্ছন্নতা তৈরি করল আগের মতো। বোঝা গেল, পড়তে হবে আরও। ফিরে আসতে হবে। এমন কবিতা ভালোবাসি। আজকের। এমন।

অলোকপর্ণা অলোকপর্ণা : taniya... protishthan kobitata sob cheye bhalo laglo.. aar ei line tay onek khorak pelam ল্যাংড়া পা পতাকা দিয়ে মুড়েছে টালি আর ক্ষত।

Astanirjan Dutta : Dipankar dar kabita gulo porley mone hoi..oi je dipankorda amar samnei kabita gulo porchheeeeee....sei porar tan tuku amar rakte bes vese ase..Nilabjyo da pratham kabitar kachhe amio frized...r oi gargol hoye jachhi....fatafati vaswatidi....arjun asadaharan re. baho ..hasan...

Sukumar Choudhuri : ভালো লেখা কাকে বলে।

Anupam Mukhopadhyay : কেন দাদা? চাই সেই লেখা? গোটা দুই, জ্যান্ত ?

Sukumar Choudhuri : অনেক কটা ভালো লেখাjoka Dipankar ! Kudos ! Anupomer moto kore boli ভালো লেখা কাকে বলে বুঝতে পারছি না ।

Anupam Mukhopadhyay : Sukumar- দা, আমাদের এখানে একটা গ্রাম আছে। তার নাম... ময়রাকাটা। জানি না সেখানে কদাপি ব্যোমকেশের পদচিহ্ন পড়িয়া কি ছিল?

Quamrul Bahar Arif : কবি তানিয়া চক্রবর্তীর কবিতাগুলো এক অন্য রকম উপস্থাপন মুন্সিয়ানায় আলোকিত করেছে। শব্দের খেলায় হেঁটে গেছেন প্রান্ত থেকে প্রান্তে। দশটি কবিতার প্রায় প্রত্যেকটিতে তিনি পাঠককে ভাবিয়ে তুলেছেন এটা মনে করি। তাই বিশেষ কবিতা নয় পুরো কবিতাই আমাকে আচ্ছন্ন করেছে, ভাবিয়েছে। কবিতার রাজ্যে তানিয়া বুঝি নতুন বার্তাবাহক। নাগরিক জীবন থেকে তানিয়ার কবিতা প্রসারিত হয়ে প্রকৃতি আর প্রেমে সাঁতার কেটে পাড়ি দিবে মানবতার মহাসমুদ্রে এ বিশ্বাস রইলো।

Amitabha Mukhopadhyay : "কাঠবাদামের কান্না" বা জন অ্যাশবেরির লেখা দুটোর- ই মূল লেখাগুলো পড়িনি- তবু দুটি ভাষায় দুটি মৌলিক ভালো কবিতা পড়ার অভিজ্ঞতা হলো। "পুনরাধুনিক" বিষয়ে আর একটু জেনে বুঝে অনুপম মুখোপাধ্যায়ের কবিতা বিষয়ে মন্তব্য করার সাহস হবে। অন্তর্নির্জন ও সঙ্ঘমিত্রা হালদারের কবিতা " আধুনিকতার" নিরিখে বা কবিতার একটা চিরকালিন মূল্যমানের নিরিখে পাঠককে নাড়ানোর ক্ষমতা রাখে। কেন ভালো লাগলো সেটা এই পরিসরে বলা মুশকিল, সুযোগ পেলে বলব। আপনার প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই, দীপঙ্করদা. . .

Shunyakaal Webzine : ধন্যবাদ প্রফেসর অমিতাভ । আশাকরি আপনি ভালো আছেন, মস্তিতে আছেন ! জন অ্যাশবেরীর মূল কবিতাটার লিংক ও বাংলাদেশের প্রতিভাবান ব্যতিক্রমী কবি হাসনাত শোয়েবের "কাঠবাদামের কান্না" আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও এখানে দিলাম ফর ইওর কাইন্ড পেরিউসাল। এই দুটি কবিতা সম্প্রতি যখন রেস্পেকটিভ অনুবাদকদ্বয়কে দেই অনুবাদের জন্য তাঁরা তখন ভীষণ ব্যস্ত নানান জৈবনিক কমিটমেন্টে। তবুও আমার কথা রাখতেই, নির্দিষ্ট সময়ে, তাঁরা ব্রিলিয়ান্টলি এ টাস্ক সমাধা করে আমাকে পাঠান। অমৃতা নীলাঞ্জনার অনুবাদের জন্য খোদ কবি হাসনাত শোয়েব কি মন্তব্য করেছেন তা এই মুহূর্তে সর্বজনবিদিত। কিন্তু আপনার ক্রিটিক্যাল মাইন্ড যেন দিলীপ ফৌজদারের অনুবাদের যথার্থ মূল্য নিরূপণ করে তার জন্য নতজানু হবো।
http://www.poets.org/poetsorg/poem/my-philosophy-life.

হাসনাত শোয়েব
কাঠবাদামের কান্না

সেটা খুব সম্ভবত যীশুকাল। যখন ময়ূরের সাথে নেচে- গেয়ে আমার বাবা ঘরে ফিরেছিল। আর আমরা রাত গভীর হলেই কাঠবাদামের কান্না শুনতে পেতাম। বাবা তার ঘুঙুর খুলতে খুলতে বলত - যেখানে মোরগের পালক উলটে পড়ে থাকে অথবা শিশুদের মুখস্থ বিদ্যার পাশে শুয়ে থাকে যাযাবর ঘ্রাণ সেখানে গিয়ে নাচবিনা। পাপ হয়।
অতঃপর বিবিধ ঘ্রাণ এবং পাপ মাথায় নিয়ে আমরা ঘুমাতে যেতাম। শহরে নানা রকম পাপীদের সাথে আমার প্রায় দেখা হতো। যাদের বেশিরভাগই ঘুড়ি উড়াতে জানতো না। আরেকদল ছিল যারা

কখনো পাহাড়ে উঠেনি। আমি দেখেছিলাম একদল যুবক মৌমাছির ঘ্রাণ শুষে নিয়ে নিজেদের পাপ স্বীকার করে নিয়েছিলো বলে যাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। সেখানেই আমি কনকের খোঁজ পেয়েছিলাম।

আমাকে ওইদলে দেখে কনক বলেছিল
- শেষ পর্যন্ত তোর তাহলে সাহস হলো। অথচ আমি মরে যাওয়ার সময় শেষবারের মত হাতটা ধরার সাহস তোর ছিলোনা। খুব হাসি পাচ্ছিল যখন দেখলাম তুই দেয়ালঘড়ির ঘণ্টার কাঁটাটা ধরে কাঁদছিলি। স্রেফ মৃত মানুষের হাসার নিয়ম নাই বলে হাসিনি।
- কিন্তু সেদিন তুই মরেছিলি কেন? অথচ তোকে আমি ময়ূরের জীবন সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য ফিরিয়ে দিয়েছিলাম।

- এরপর দীর্ঘশ্বাস ছায়া ও ছায়াহীনভাবে দীর্ঘ হতে থাকে।

আয়নার সামনে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াই আমি, তুমি এবং সে। আয়না থেকে কেবল একটিমাত্র মুখোশের প্রতিচ্ছবি ভেসে আসছিল। যার বাদামি কেশর থেকে জাফরানের সুগিন্ধে ভেসে যাচ্ছিল মাতামহীর নাচঘর।

- শেষবারের মতো আবারো কাঠবাদামের কান্না শুনতে শুনতে হয়তো ঘুমিয়ে কিংবা না ঘুমিয়ে পড়ি।"

অনুপমের কাব্যডায়েরী "পুনরাধুনিকের" নিরিখে বা অস্তনির্জন দত্ত বা সংঘমিত্রা হালদারের কবিতা "আধুনিক" স্ট্যান্ডপয়েন্ট থেকে দেখতে হবেই এমন কোনো মাথার দিব্যি নেই, কমসে কম আপনার মতো বিদগ্ধ প্রফেসরের পক্ষে। যাহা অধুনা তাহাই আধুনিক - আপনার শিক্ষাদীক্ষা, গবেষণা এই মেনেই চলুক । কবিতার হাজারো ঢাল ও পোয়েটিক লাইসেন্স আছে, তাই অস্তনির্জন ও সংঘমিত্রার কবিতা প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। অনুপম দীর্ঘদিন ধরে কবিতা লিখছেন, একটি পথিকৃত মাসিক ওয়েব ম্যাগাজিন "বাক" এর সিনসিয়ারলি সম্পাদনা করছেন। পাঁচ বচ্ছর অতিক্রান্ত হলো। মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমায় অবস্থানগত কারণে, লোকাল স্কুলে মাস্টারি করার কারণে, আমার এই নগন্য দিল্লী থেকেই একটি আপস্টার্ট স্টুডেন্ট একদিন এই শ্রদ্ধেয় মাস্টারের অবমাননা করে বসে। সে এক এতোল বেতোল গা- ঘিনঘিনে ইতিহাস, যদিও তার মধুরেণ সমাপয়েত হয়েছে। আমি শুক্কুরবার উইকএন্ডে মাল খাবো আর ইতিহাস মারাবো না - তা কি হয় প্রফেসর ? তো, এহেন মাস্টারকে আমি বললাম যে এবারকার সংখ্যায় তোকে কাব্যডায়েরি দিতে হবে। তোর আর তোর ডায়েরির একটা স্বগত কথন থাকবে। কোথাও ছাপা হবে, পাবলিক পড়বে, এজন্য এডিট করবি না। অটো রাইটিং হবে। কাফকা যে ভাবে ডায়েরী লিখে ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখতো, সেভাবেই তোর এ লেখাটার আকরিক ট্রিটমেন্ট করবি। এ মাস্টার আমার মতো কালা অক্ষর ভঁইনস বরাবর ইনসানের কথা রেখে ওভাবেই লেখাটা পাঠিয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রেও আমি পুনর্বার নতজানু হবো যাতে অনুপমের কাব্যডায়েরির সুবিচার হয়। বাকি আপনার যে কোনো ক্রুর মন্তব্য শিরোধার্য। উভয়ের স্বার্থেই।

Anupam Mukhopadhyay : মাস্টারকে যে মায়েস্ত্রো বানিয়ে দিচ্ছেন !

Ami t abha Mukhopadhyay : এই অ্যাতোটা বলার জায়গা করে তাকে মস্তিস্কের অনুশীলনী করে দেবার জন্যে ধন্যবাদ, দীপঙ্করবাবু। প্রথমত জানাই আমার পেশাও একটি মফস্বলের মাস্টারি, দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা কলেজে। কবিতা পড়ার সময় আমার টেক্সটবুকীয় ছিটেফোঁটা বিদ্যে খুব একটা কাজ করেনা, একটা খসখসে খোলানের উপর দিয়ে মানুষ যে ভাবে হেঁটে যায়, একটা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাবার সময় গাছের পাতা ও চোরকাঁটার পরশ যেভাবে আক্রান্ত করে, মূতের গন্ধময় স্বপ্নের থেকে যেভাবে মানুষ পরিত্রাণ চায়, আয়নার সামনে যেভাবে চমকে ওঠে- - আমার কবিতা- সফর, কবিতা পাঠকালীন সফর কতকটা সে রকমই। দ্বিতীয়ত, আমি বিদগ্ধ নই (যদিও জৈবনিক ও ব্যুৎপত্তিগত ভাবে বলতেই পারেন)। তৃতীয়ত, আমাদের উইক- এন্ড শুক্রবারে হয় না, সুতরাং আপনারা ভাগ্যবান। কবিবর অনুপম মুখোপাধ্যায় ও তাঁর লেখালেখির সঙ্গে আমি এই ফেসবুক মারফত- ই অল্পবিস্তর পরিচিত। তবুও ইতিহাস ছুঁইয়ে কবিতার ভিতরে ঢোকার রাস্তা দেখালেন দেখে ভালোই লাগলো। আসলে ওনার বেশ কিছু লেখা পড়েছি, কিন্তু ওই, ভিতরে ঢুকতে অসুবিধা হয়েছে, সেটা আমার কবিতা পাঠক হিসেবে অক্ষমতাও বলতে পারেন।কাব্য- ডায়েরীর মধ্যে এক ধরণের spontaneous ব্যাপার এমনি- ই তো থাকে। আমি খুব- ই বিনীত ভাবে সেই প্রবেশ দ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। কবিতা বিষয়ক কোনো moral বা মূল্যমান সেট না করেই পড়তে গেলাম, তার ফল খুব সুবিধেজনক হচ্ছেনা দেখেই ওই মন্তব্যটি করতে বাধ্য হয়েছি। চেষ্টা করব অবশ্যই । কবি ও সমালোচক, উভয়ের লাইসেন্সকেই শিল্প স্বীকৃতি দিয়েছে। এখন কোনটা কার উপর কখন জাঁকিয়ে বসে সেটা বোধহয় আমরাও ঠিক করে দিতে পারিনা।

Shunyakaal Webzine : সেলাম প্রফেসর, সেলাম কবি অমিতাভ, আপনার উইকএন্ড হয়নি, তাই খাননি। আমার উইকএন্ড হয়েছে তাই খেয়েছি। কাল কথা হবে। শুভরাত্রি।

Anupam Mukhopadhyay : 'শব্দমদ- বেচা শুঁড়িগুলো / কাব্যলক্ষ্মীর দেহ চিরদিন কচি রেখে দিল। / শুঁড়িগুলো সব মরে যাক, / কাব্যলক্ষ্মীর দেহে যৌবনের জোয়ার ঘনাক।'

Ruhul Mahfuz Joy : তানিয়া চক্রবর্তীর সবগুলো কবিতাই ধারালো। তবে কয়েক জায়গায় ইংরেজি শব্দের ব্যবহার একটু বেশি মনে হয়েছে, আবার কোথাও কোথাও কবিতার ভাবের সঙ্গে গেঁথে গেছে। দশটি কবিতাই সুখপাঠ্য। হাসনাত শোয়েব বেশ ভাল্লাগলো। বিশেষ করে প্রথম কবিতাটা।

Gourob Chakraborty : ekta samogrik valolaga... laglo!

Soumen Bose : কাব্যডায়েরি : অনুপম মুখোপাধ্যায় (অত্যাচার, পাঠকের উপর), অনুবাদ কবিতা : দিলীপ ফৌজদার (খুব ভালো), অমৃতা নীলাঞ্জনা, বারীন ঘোষাল, ভাস্বতী গোস্বামী, দীপঙ্কর দত্ত (বাংলা কবিতার কাগজে অন্যভাষার কবিতার বাংলা অনুবাদ থাকবে, কিন্তু বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদের কারণ বুঝতে পারলাম না! ! !)
কবিতা : বারীন ঘোষাল (ওনার মতো), তানিয়া চক্রবর্তী (ভাঁজ বেশি, কাব্য কম), রঞ্জন মৈত্র (ভালো), জপমালা ঘোষরায় (আবোল তাবোল, ব্যক্তিগত সংস্করন), অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায় (বিক্ষিপ্ত ভাবনা ও শব্দের কড়া শরবত), দেবযানী বসু (বক্তব্য কি কবিতা?), নীলাব্জ চক্রবর্তী (অস্তনির্জন দত্ত কে টুকছেন, দুজনে একান্তে কথা বলে নেবেন ভাই), সঙ্ঘমিত্রা হালদার (এই সংখ্যার সেরা কবি, দারুন, দারুন), হাসনাত শোয়েব (ভালো), যাদব দত্ত (আগামীতে ভালো লিখবেন), অস্তনির্জন দত্ত (নীলাব্জ চক্রবর্তী কে টুকছেন, দুজনে একান্তে কথা বলে নেবেন ভাই) , হাসান রোবায়েত (খুব ভালো), উমাপদ কর (ভালো), দেবাশিস মুখোপাধ্যায় ((বিক্ষিপ্ত ভাবনা ও শব্দের মিঠে শরবত), গৌরব চক্রবর্তী ((ভালো, ভালো), ভাস্বতী গোস্বামী (কবিতার প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রী), মোস্তাফিজ কারিগর (সত্যিই খুব ভালো), সোম সরকার (ভালো), কৃষ্ণা মিশ্র ভট্টাচার্য (ওনার ইংরেজিতেই লেখা উচিত), দিলীপ ফৌজদার (কি যে বলবো, আমার গুরুজন), দীপঙ্কর দত্ত (কবিতা কোনমতে হয় নি, দালির ছবি, বা বুনুয়েলের সিনেমা)
প্রবন্ধ : রমিত দে (পড়া হয়ে ওঠে নি)

Srotosvini Chattopadhyay : তানিয়া চক্রবর্তীর "দরজা" কবিতাটা সব থেকে ভালো লাগলো। Onnoder kobitao bhalo legeche..sanghamitra haldar, barin ghoshal enader kobitao bhishon bhabe mon kereche.

Debjani Basu : lyrical ballader mato ekta shatabdiprachin premer galpo porlam. uh satyi jeno pratna ratner sandhan peye gechhi. Ramiter erakam onusandhan jari thak. Taniyar eliod or illyod englishe ki banan habe janina valo legechhe. Taniya ekhane man khule likheche, Taniyake boli o amar lekha niye ki vabchhe jodi bale..... ar Dipankar..... khabar niye khelte khelte tui ekdin ekta puro manuser sarir toiri korte parbi jar akriti prithibir saman saman takhano amra kabita kei khujbo jar jar nijer mato kore.

Reena Chakraborty : অর্জুন....অনুপমকে পড়লাম....ভালো লেগেছে. . . .

Giasuddin Dalal : কাজী নজরুল ইসলামের সামগ্রিক রচনাবলী এই প্রথম অনূদিত হচ্ছে ইংরেজিতে। কবিতা, গান, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটিকা, প্রবন্ধ, বক্তৃতা সব। চাইছি নির্বাচিত কিছু আপনি প্রকাশ করুন। উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

Taniya Chakraborty : "কোটিপতি লং মার্চে এসো... " দেবযানীদির লেখা ভালো লেগেছে, রমিতদার লেখাটিও ভালো লাগল, সামগ্রিক অর্থে শূন্যকালের এবারের সংখ্যাটিও যথেষ্ট পরিণত- - - ভালো লেগেছে

Pranab K Chakraborty : Nice a journey. Congratulations. Kaal nirantar gorchhe / vangchhe. Gara-vangay garachchhe chakaa...avinandan. Aro ak prastutir pratyashay aro kichhu benche thakar uttap jama hote thak.

Novera Hossain Nelly : Congrats...

Deb Jyoti Basu : It gives me undiluted pleasure in going through the fine presentation and the unique efforts made by Sunyakaal and its editorial team. A vernacular magazine with a fair amount of English translation has added a new flavor to the arrangement of poetry in this edition. This is the uniqueness which has, in its own way, assuaged the internal dilemma . However the linguistic graphics involved in presenting any translation of poetry has to looked into more seriously in terms of translating the idea more than the language which has been used in the original text. In other words the libretto stands denied in the linguistic fervor of literal translation as the idea is gradually lost into the background. That in my opinion, subject to correction , tantamount to the murdering poetry as the universal cadence which is the life of poetry is obfuscated behind the flurry of words which on the face of it is thoroughly misused and contextually irrelevant, if not meaningless. In this regard may I draw the attention of the general reader to some of the translations in this edition which require a critical analysis of the treatment given to them in translation. I leave it to the readers to judge and comprehend the helplessness of a true admirer of poetry when such levels of translation are allowed to circulate unabated by constructive criticism. I would once again

thank the entire organization of Shunyakaal for making an honest and sincere attempt to hold the imagination of the readers and for the propagation of Bengali poetry which is fast fading out in a competitive world.

Hasnat Amzad : ৮/ শহর তুমি চামড়া ঢাকো- - - হট প্যান্ট
চামড়া ঢাকো ঈশ্বরী
অ্যাপল অফ প্যারাডাইস - - - চামড়া ঢাকো ইতিবাচক
যতই ওপরে থাক ডিম্বাশয় - - - ওসব কোনো যুক্তি নয়
উহ্য থাক প্যালেস্টাইন
যতই নীচে থাক শুক্রাশয় - - - ওসব কোনো মুক্তি নয়
উহ্য থাক প্যালেস্টাইন
মিছিল ঘোরে, রেচন হলে ঘুমিয়ে পড়ে
ঘরকে বল - - - ঘরকে বলো মিছিল হতে
ইট খুঁড়লেই মাটি, মাটির তলায় জল
- - - এবার জল জীবন ========== চমৎকার, তানিয়া চক্রবর্তী।

Arjun Bandyopadhyay : dhonyobaad Soumen Bose. apni sobbar lekha eto khNuTiye poRe eto joruri mot janalen. khali, bismito holam apni ekjoner lekha niyei kichchhu bollen na dekhe. oi je ekdom opore Kafka namer ek bhadrolok jeTa likhechhen. lekhaTa ami ekhane copy kore dilam barong.

“Don't bend; don't water it down; don't try to make it logical; don't edit your own soul according to the fashion. Rather, follow your most intense obsessions mercilessly.”

Anupam Mukhopadhyay : একটা reader-friendly ডায়েরির খোঁজ আমাকে দেবেন প্লিজ? মানে, প্রফেসর শংকুরটা বাদে ?

Shunyakaal Webzine : অনেক আছে। Amazon থেকে আনিয়ে এটা আগে পড়ে ফেল। The Diary of a Young Girl : Anne Frank

Dilip Fouzdar : Ramit Dey je bishoy niye probandha ti likhechhen seta ekta prachin abosthay niye jete parchhe - chithi ekta atmajibani hoye othe tar karon setar content sudhu ghanisthorai jane ar ghanisthora chithir content er

anekkhanii jane. Ota sahityo hoy samoykalta periye asar par jakhan abeg anektai stimito. Lekhar gune probandhoti daag katchhe. Ajker dine chithi obsolete. Keu chithi likhle byaparta oupacharik hoye jay - premik-premikader bhetore adhuna chithi chalachali hoy ki na jana nei, oi abosthata anek din aage pechhone fele esechhi tabuo Ramiter lekha pore ekbar mone holo chithi e-mail ba social mediagulir theke anek beshi sthayi, surakkhito ar nirvarshil medium. Hyan, Ramiter lekhatar ekta content o achhe. Tathya o galper ei sankalan o kichhu felna noy. Incest o bikhyato manusder jiban niye emon lekhar mukhomukhi kam i hoyechhi.

Manik Saha : The Diary of a Young Girl... বাংলা এবং ইংরেজি ২ ভাষাতেই e book হিসেবে পেয়ে যাবে। সত্যি অসাধারন একটি বই। এত ছোট একটি মেয়ে যে এভাবে লিখতে পারে, ভাবাই যায় না!

Rangeet Mitra : পড়লাম। বেশ ভালো সংখ্যা...আমার ভিতর সেই সব সুখ স্মৃতির হাওড়াব্রীজ হয়ে আছে।

Pradip Bhattacherji : Morbid.

Mohammod Omar Farooq : অনেক ভাল লাগলো।

Mou Das Gupta : শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ... সবাই পড়ুন ও পড়ান. . .

Rajib Sinha : khubi onyo dharar... bhalo laglo apnader udyog.

Soumen Bose : ভাই অর্জুন, কোনো রচনার উধরিতি পরে কোনো মতামত দিতে নেই, কারণ তার আগে ও পরে অনেক কিছু থাকে। সৎ উধরিতি তো অসৎ লোক নিজের অসৎ কাজ সিদ্ধি করবার জন্য ব্যবহার করতেও পারে। আর আমি কবিতা খুব খুঁটিয়ে পড়ি। কারণ জীবনে ওই একটা বিষয় কে খুব ভালোবেসে ফেলেছি। আমার খুব খারাপ লাগে যে তোমাদের / তোমার মত প্রতিশ্রুতিবান ও ক্ষমতাশালী কবিদের কিছু না হতে পারা সেল্ফ মেড গুরুঠাকুর মুর্শিদপুর বা কালোপাহাড়ে বসে অকবিতার পথ দেখান। আর আমরাও নানা অক্ষমতার কারণে, তোমার বা তোমাদের কাছে পৌছাতে পারি না। অক্ষমতাটা মূলত আর্থিক। বর্তমানে তোমার শরীর কেমন আছে

? চিকিতসা ঠিকঠাক করো। তোমার আরোগ্য প্রার্থনা করি।

Nilabja Chakrabarti : বাবুভাই বাবুভাই আফনের অসুখ করসে। কঠিন অসুখ। সবজান্তা-বেম্মজ্ঞানী- টাইপ অসুখ। আমি খাস দিলে আফনের লাইগ্যা দোয়া করুমনে। সাইরা যাইব. . .